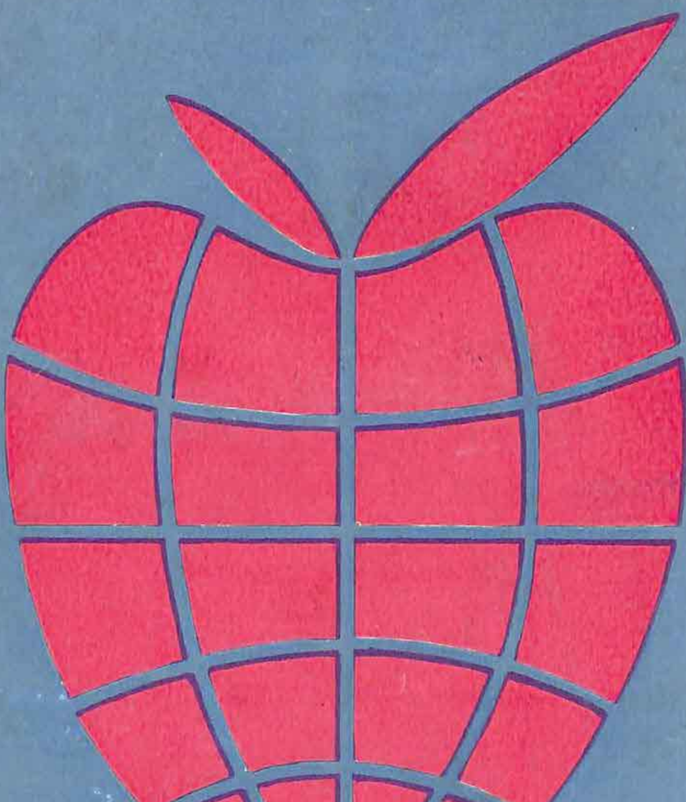
বিজ্ঞানের হরেকরকম

অনীশ দেব



বিজ্ঞানের

হরেকরকম

অনীশ দেব

স্বপ্নদীপ
৭ই শীতলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৫

প্রথম সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

স্বপ্নদীপের পক্ষে মিতা সাহা কর্তৃক ৭ই শীতলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৫ থেকে প্রকাশিত এবং ইম্প্রেসন
প্রবলেমের পক্ষে গণেশচন্দ্র শীল কর্তৃক ২৭এ
তারক চ্যাটার্জী লেন কলকাতা-৭০০০০৫
থেকে মুদ্রিত

সাত টাকা

শ্রীরবীন বল-কে
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে

হরেকরকম বিষয় সূচী

‘মাপ’ এলো কোথা থেকে

মাপ জিনিসটা আমাদের সবসময়েই ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে। জামা কিনতে গেলেও মাপ বলতে হয়, আবার পেরেক কিনতে গেলেও সেই মাপ-এর হাত থেকে নিস্তার নেই। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই মাপ জিনিসটা ঠিক মতো চালু হয়েছে মাত্র একশো আশি বছরের কিছু বেশি সময় ধরে। তার আগে এই মাপ নিয়ে ভারী মজার ব্যাপার হতো।



যেমন ধরো, তুমি হয়তো এক ফুট লম্বা একটা কাঠের টুকরো কিনতে চাও। বেশ, কিনে ফেললে। তার পরই হয়তো গেলে এক ফুট জামার কাপড় কিনতে। কেনার পর দেখলে, এই দুটো এক ফুট মাপের জিনিসের মধ্যে প্রায় ছ’ ইঞ্চি তফাৎ! এর কারণ, তখন বিভিন্ন পেশার কারিগর ও ব্যবসায়ীদের কাছে ঐ ‘এক ফুট’ মাপের অর্থ ছিলো বিভিন্ন রকম। সোজা কথায়, এক ফুট-এর নাম করে যে যা খুশি মাপ চালাতো। আবার, এক দেশ থেকে অন্য দেশে গেলেও এই মাপ-এর তফাৎ হতো।

তখনকার দিনে বিভিন্ন সব ‘মাপ’ তৈরী হয়েছিলো মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপ থেকে। যেমন, বুড়ো আঙুলের গোড়া যতটা চওড়া, তাকে বলা হতো এক ‘ইঞ্চি’। দু-হাত দু’পাশে টান টান করে ছড়িয়ে এক হাতের আঙুলের ডগা থেকে অন্য হাতের ডগা পর্যন্ত যতটা দূরত্ব হয়, তাকে বলা হতো এক ‘ফ্যাদম’—যা দিয়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হতো। আর, এক ‘ফুট’ ছিলো ইংল্যাণ্ডের রাজার পায়ের যা মাপ, তাই—ভাবতে পারো?



এই রকম খেয়াল খুশি মতো 'মাপ' নিয়ে নয়-ছয় দেখে ১৭৯১ সালে 'ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমী' মাপ-এর এক আন্তর্জাতিক মাপকাঠি তৈরীর সিদ্ধান্ত নিলো। তারা বললো, পৃথিবীর মাপের ওপর ভিত্তি করে এই মাপকাঠি তৈরী হবে। উত্তর মেরু অথবা দক্ষিণ মেরু থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত যে দূরত্ব, তার এক কোটি ভাগের এক ভাগকে বলা হবে এক 'মিটার'। সুতরাং, তাই করা হলো। প্লাটিনাম ও ইরিডিয়াম ধাতুর মিশ্রণে তৈরী একটা দণ্ডের গায়ে ঐ দূরত্বে দুটো দাগ খোদাই করে ফরাসী আকাদেমী তৈরী করে ফেললো 'আদর্শ মিটার'। এই দণ্ডটা রাখা আছে প্যারিসের খুব কাছে সেইভ শহরের 'ওজন ও পরিমাপ সংস্থায়', আর তার অজস্র নিখুঁত কপি তৈরী করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দেশে।

একটা কথা এই ফাঁকে চুপি চুপি বলে রাখি। আমাদের মাপজোপের যন্ত্রপাতি আরও উন্নত হবার পর দেখা গেছে, ফরাসী আকাদেমী পৃথিবীর যে মাপ ধরেছিলো, পৃথিবীর মাপ আসলে তার চেয়েও কিছুটা বেশি। এটা জানার পরেও কিন্তু ঐ 'আদর্শ মিটার'এর কোন পরিবর্তন করা হয়নি।



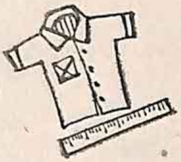
১৯৬০ সালে প্লাটিনাম-ইরিডিয়ামের দণ্ডের ওপর খোদাই করা দাগ দুটোর দূরত্বের এক নিখুঁত মাপ নেওয়া হলো আলোক-বিজ্ঞানের সাহায্যে।

তোমরা হয়তো জানো, আলো এক ধরণের তরঙ্গ বা ঢেউ। অসংখ্য আলোক-কণিকা, যার কেতাবী নাম ফোটন, ঢেউয়ের মতো ছুটে চলে দুরন্ত গতিতে। ফলে আলো এসে পড়ে আমাদের চোখে। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুকে উত্তেজিত করলে তারা নিজস্ব এক-একরকম আলো দেয়। ক্রিপ্টন নামে একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে—নিষ্ক্রিয়, কারণ এই গ্যাস কারো সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। ক্রিপ্টন গ্যাসের পরমাণু উত্তেজিত অবস্থায়

কমলা-লাল রঙের একরকম আলো দেয়। আলোর এক একটি তরঙ্গ যতোটা লম্বা, তাকে বলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কিন্তু খুব ছোট। ফলে 'এক মিটার' দূরত্ব ক্রিপ্টন গ্যাসের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দিয়ে মাপতে গিয়ে দেখা গেলো, এক মিটার সমান সমান ১৬,৫০,৭৬৩·৭৩গুলো তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য !

সুতরাং, এটাই হয়ে দাঁড়ালো এক মিটার মাপ-এর নিঁখুত সংজ্ঞা। এখন সারা পৃথিবীর 'আদর্শ মিটার' এর দণ্ডগুলো যদি গলিয়ে পেপারওয়েট বানিয়ে ফেলা হয়, তাহলেও আমরা ক্রিপ্টন গ্যাস ও আলোক-বিজ্ঞানের সাহায্যে আবার ঐ রকম 'আদর্শ মিটার' তৈরী করে ফেলতে পারবো।

এরপর ধীরে ধীরে প্রচলিত হয়ে পড়লো মাপের 'মেট্রিক' পদ্ধতি। যেমন, কিলোগ্রাম, মিটার, কিলোমিটার ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলে ফুট, মাইল, পাউণ্ড, টন এগুলো কিন্তু একেবারে অচল হয়ে যায়নি। প্রযুক্তিবিদ্যার কাজে এই এককগুলো এখনও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।



পশু-পাখির শরীরের তাপ ঃ এক আশ্চর্য ঘটনা

কোন সুস্থ মানুষের শরীরের তাপমাত্রা কতো? তোমরা নিশ্চয়ই বলবে ৯৮.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা প্রায় ৩৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছো, কেন এই বিশেষ তাপমাত্রায় আমাদের দেহের তাপ স্থির হয়ে থাকে? এর কারণ হলো সমতা। অর্থাৎ, আমাদের শরীরের ভেতরে যে তাপ তৈরী হয়, তার কিছুটা আমাদের কাজে লাগে, আর বাকীটা বাইরের বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। যখন এই তাপ উৎপাদন ও বর্জনের মধ্যে একটা সমতা তৈরী হয়, একমাত্র তখনই আমাদের শরীরের তাপমাত্রা কোন নির্দ্দিষ্ট মানে স্থির হয়—যেমন, ৩৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

যদি উৎপাদনের হার বেড়ে যায়, অথচ বর্জনের হার একই থাকে, তাহলে আমাদের দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে—যাকে আমরা সাধারণভাবে বলি 'জ্বর'। অর্থাৎ, শরীরের ভেতরে কোন অসুস্থতার জন্যই তাপ উৎপাদনের হার বেড়ে গেছে। ফলে তাপের সমতা নষ্ট হয়েছে।

একইরকম ভাবে, উল্টোটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমাদের দেহের তাপমাত্রা যাবে কমে। খুব ঠাণ্ডার দেশে গিয়ে গরম জামা-কাপড় পরে শরীরের তাপ ধরে রাখতে না পারলে যে অবস্থাটি হয় আর কি!

সুতরাং এই আলোচনা থেকে সহজেই বুঝতে পারছো, যদি শরীরের তাপমাত্রাকে একটা নির্দিষ্ট মানে বেঁধে রাখতে হয় তাহলে শরীরের ভেতরে প্রতি সেকেণ্ডে যে তাপ তৈরী হবে, ঠিক সেই পরিমাণ তাপ প্রতি সেকেণ্ডে ছেড়ে দিতে হবে বায়ুমণ্ডলে। জীবজগতের প্রতিটি পশুপাখি এই নিয়ম মেনে চলে।



প্রাণীদের শরীরের ভেতরে যে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, তা থেকেই উৎপন্ন হয় প্রয়োজনীয় তাপ। কোন প্রাণীর শরীরে কতোটা তাপ তৈরী হবে, সেটা নির্ভর করে তার আয়তনের ওপর। আর, কি হারে সে তাপ বর্জন করতে পারবে, সেটা নির্ভর করে তার শরীরের ক্ষেত্রফলের ওপর। যেমন, কোন মোটা মানুষের শরীরের ক্ষেত্রফল বেশি, ফলে তার তাপ বর্জনের হারও বেশী। অতএব, এই আয়তন ও ক্ষেত্রফলের ওপরেই নির্ভর করে, দেহের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট মানে স্থির রাখতে কোন প্রাণী তার প্রতি একক আয়তনে কি হারে তাপ তৈরী করবে।

এবারে একটা কাল্পনিক উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক।

ধরো, দুটো বিভিন্ন প্রাণীর আয়তন হুবহু সমান। কিন্তু চেহারা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ফলে, একজনের শরীরের ক্ষেত্রফল একশো বর্গ সেন্টিমিটার ও অপরজনের শরীরের ক্ষেত্রফল এক হাজার বর্গ সেন্টিমিটার। এখন যদি দুটো প্রাণীকেই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় খোলা জায়গায় রেখে দেওয়া হয়, তাহলে পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ প্রক্রিয়ায় দুজনেই তাপ বর্জন করবে। মনে করা যাক, প্রতি একক ক্ষেত্রফলে তাপ বর্জনের হার দুজনেরই সমান। তাহলে দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রফল প্রথম জনের তুলনায় দশগুণ বেশি হওয়ায় তার তাপ বর্জনের পরিমাণ হবে দশগুণ বেশি। সুতরাং দুজনেরই শরীরের তাপমাত্রা সমান রাখতে হলে, দ্বিতীয়জনকে প্রথমজনের তুলনায় দশগুণ বেশি হারে তাপ তৈরী করতে হবে নিজের শরীরে।



সুতরাং এ থেকে বোঝা গেলো, কোন প্রাণীর তাপ তৈরীর হার নির্ভর করবে তার শরীরের ক্ষেত্রফল ও আয়তনের অনুপাতের ওপর। প্রাণীর আকার যতো ছোট হয়, এই অনুপাতের মান ততো বড় হয়।



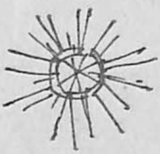
এবারে দু-একটা সত্যিকারের উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক।

হামিং বার্ড নামে একরকম খুব ছোট্ট পাখি আছে। এদের ক্ষেত্রফল ও আয়তনের অনুপাত খুব বেশী। সুতরাং এদের শরীরের ভেতরে রাসায়নিক বিক্রিয়াও হয় খুব দ্রুত হারে—ফলে তাপ উৎপন্ন হয় প্রতি ঘণ্টায় শরীরের প্রতি গ্রাম ওজনে ০.৬৬ ক্যালরি। এক গ্রাম জলকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকেই বলে এক 'ক্যালরি'। শুনলে অবাক হবে, হামিং বার্ডের এই হার কোন হেলিকপ্টারের শক্তি উৎপাদনের হারে রসমান—অথচ, একটা হামিং বার্ডের ওজন মাত্র ছ' থেকে আট গ্রাম।

বিশাল প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই হার কিন্তু খুবই কম। কারণ, শরীরের ক্ষেত্রফলের তুলনায় তাদের আয়তন অনেক বেশী। যেমন, হাতীর তাপ উৎপাদনের হার প্রতি ঘণ্টায় শরীরের প্রতি গ্রাম ওজনে মাত্র ০.০১ ক্যালরি। হামিং বার্ডের সঙ্গে সমান হারে সেও যদি তাপ তৈরী করতো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে পুড়ে ছাই হয়ে যেতো—কারণ, তখন তার শরীরের তাপমাত্রা হতো উনুনের আঁচের সমান!

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আমাদের, অর্থাৎ, মানুষের ক্ষেত্রে এই হার ০·০৩ ক্যালরি প্রতি গ্রামে প্রতি ঘণ্টায়।

সবশেষে বলি সূর্যের কথা। সূর্যের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং ওজন ২২ × ১০^{২৭} টন—অর্থাৎ, দুই-এর পরে সাতাশটা শূন্য বসালে যে বিশাল সংখ্যা পাওয়া যায়, ততো টন! কিন্তু তার ক্ষেত্রফল ও আয়তনের অনুপাত এতো কম যে প্রতি গ্রামে প্রতি ঘণ্টায় সূর্যের ভেতরে মাত্র ০.০০০০১৭ ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়! সত্যি, আশ্চর্য ঘটনা বোধহয় একেই বলে।



দাবার চাল

এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যা আমরা সহজেই গুণতে পারি। চাই কি একশো পেরিয়ে হাজার, লক্ষ, কোটি অর্বুদ ইত্যাদির দিকেও এগিয়ে যেতে পারি। কিন্তু হিসেবের সুবিধের জন্য আমরা এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যা নিয়েই কাজ শুরু করবো। কাজটা হলো, সংখ্যাগুলো পর পর লিখে ফেলা। অর্থাৎ, ১, ২, ৩, ৪,…,৯৮, ৯৯, ১০০। এই সারি বেঁধে লিখে ফেলা সংখ্যাগুলোকে বলা যেতে পারে একটা 'শ্রেণী'। আমাদের শ্রেণীটার একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব রয়েছে। সেটা হলো, যে কোন সংখ্যা তার আগের সংখ্যাটির চেয়ে ১ বেশি, এবং পরের সংখ্যাটির চেয়ে ১ কম। সোজা কথায়, পাশাপাশি যে কোন দুটো সংখ্যার বিয়োগফল ১। শ্রেণীটার সর্বত্র এই বিয়োগফল বা 'অন্তর' সমান হওয়ার জন্য এ জাতীয় শ্রেণীকে বলা হয় 'সমান্তর শ্রেণী'। আমাদের সমান্তর শ্রেণীর 'সাধারণ অন্তর' হলো ১। সাধারণ অন্তর যদি ৪ হয় তাহলে সমান্তর শ্রেণীটার চেহারা দাঁড়াতো, ১, ৫, ৯, ১৩, …ইত্যাদি।

ঠিক একই ধরণের আর একরকম শ্রেণী পাওয়া যায় যাদের বলা হয় 'গুণোত্তর শ্রেণী'। যেমন, ১, ২, ৪, ৮, ১৬,…ইত্যাদি। এ ধরণের শ্রেণীতে পাশাপাশি যে কোন দুটো সংখ্যার ভাগফল সর্বদা সমান—এবং সেই ভাগফলকে বলা হয় 'সাধারণ অনুপাত'। যে গুণোত্তর শ্রেণীটা আমরা লিখেছি, সেটার সাধারণ অনুপাত ২।



গুণোত্তর শ্রেণী নিয়ে অনেক রকম মজার ধাঁধা তৈরি করা যায়। তার মধ্যে একটা ধাঁধা খুব প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত।

ভারতের এক প্রাচীন সুলতান ছিলেন শারহম। চাল দিয়ে দাবার ছকের চৌষট্টিটা ঘর ভর্তি করতে গিয়ে তিনি মাৎ হয়ে গিয়েছিলেন এই দাবার চালে।

সুলতান দাবা খেলা শিখেছিলেন তাঁর উজীর সিসা-বেন দাহিরের কাছ থেকে। দাহির সেই সঙ্গে একটি দাবার ছকও উপহার দিয়েছিলেন সুলতান শারহমকে। তখন খুশি হয়ে সুলতান উজীর সিসা-বেনকে তোফা, অর্থাৎ, পুরস্কার দিতে চাইলেন।

ধূর্ত উজীর বিনয়ের অবতার হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'জাঁহাপনা, বান্দার চাহিদা খুবই নগণ্য। আপনি আমার এই দাবার প্রথম ঘরটায় একটা চাল রাখুন, পরের ঘরটায় রাখুন দুটো চালের দানা, পরেরটায় চারটে, চার নম্বর ঘরে আটটা। এইভাবে জাঁহাপনা, আপনি সামান্য কয়েক বস্তা চাল দিয়ে এই দাবার ছকের চৌষট্টিটা ঘর ভর্তি করে আমাকে উপহার দিন। বান্দার আর কোন লোভ নেই।'

'এই সামান্য দানেই তুমি সন্তুষ্ট?' অবাক হয়ে বলেছেন সুলতান, 'আশ্চর্য দাবা খেলা আমাকে শিখিয়ে তার বিনিময়ে এই তুচ্ছ পুরস্কারেই তুমি খুশি? বেশ, তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।' এই কথা বলে সুলতান এক বস্তা চাল নিয়ে আসার আদেশ দিলেন খাদিমকে।

বস্তা এলো। শুরু হল চাল বিতরণ। প্রথম ঘরে একটা, দ্বিতীয় ঘরে দুটো, তৃতীয় ঘরে চারটে—এইভাবে ঘর থেকে ঘরে চালের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে চললো। কিন্তু অবাক হয়ে সুলতান আবিষ্কার করলেন, বিশ নম্বর ঘরে পৌঁছতেই তাঁর প্রথম বস্তা খালি হয়ে গেলো। আবার তিনি আদেশ দিলেন বান্দাকে। আরও চালের বস্তা এলো। কিন্তু এবারে চালের পরিমাণ ঘর থেকে ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগলো।



একটু পরেই রাজা বুঝলেন, সারা ভারতবর্ষে

যে পরিমাণ চাল আছে তার সবটুকু নিয়ে এলেও সিসা-বেন-এর 'ক্ষুদ্র' দাবী তিনি পূরণ করতে পারবেন না। কারণ সিসা-বেনের দাবী পূরণ করতে গেলে লাগতো মোট ১৮, ৪৪৬, ৭৪৪, ০৭৩, ৭০৯, ৫৫১, ৬১৫টি চালের দানা।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে এক এক বস্তায় ৫, ০০০, ০০০টি করে চালের দানা ছিলো, তাহলে সিসা-বেনের দাবী মেটাতে লাগতো মাত্র চার হাজার লক্ষ কোটি—অর্থাৎ, ৪ সংখ্যাটির পরে পনেরোটা শূন্য বসালে যে সংখ্যা পাওয়া যায়—বস্তা চাল! এক বছরে সারা পৃথিবীর চালের উৎপাদন মনে রেখে বলা যায়, মোটামুটিভাবে দু-হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত চালের উৎপাদন যদি সিসা-বেনকে দেওয়া হতো, তাহলে হয়তো তাঁর দাবী পূর্ণ করতে পারতেন সুলতান শারহম।

সুলতান শেষ পর্যন্ত সিসা-বেনের শিরশ্ছেদের হুকুম দিয়েছিলেন কিনা সেটা সঠিক জানা যায় নি।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, ১, ২, ৪, ৮, ১৬,… এই গুণোত্তর শ্রেণী দিয়েই সিসা-বেন একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন সুলতানকে! সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও গুণোত্তর শ্রেণী যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

ঝাড়লণ্ঠন থেকে পেণ্ডুলাম

সাধারণভাবে ঝাড়লণ্ঠন ও পেণ্ডুলামের মধ্যে কোন রকম সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু হঠাৎই এক অদ্ভুত সম্পর্ক এই দুটি জিনিসের মধ্যে তৈরী হয়ে গিয়েছিলো—তাও প্রায় চারশো বছর আগে! আর সেই সম্পর্ক থেকেই ঘটে গিয়েছিলো এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার।

দেওয়াল-ঘড়ির ভেতরে যে বড় চাকতিটাকে এপাশ-ওপাশ দুলতে দেখা যায়, সেই পেণ্ডুলাম আমাদের অনেকেরই চেনা। অবিরাম সেটা দুলে চলেছে, আর ঘড়িও বেজে চলেছে টিক টিক শব্দে—সময় মেপে দিচ্ছে আমাদের সবার জন্য। কিন্তু প্রথম যখন পেণ্ডুলাম আবিষ্কার হয়, তখন বোঝা যায়নি, এটা দিয়ে পরে সময় মাপা যাবে।

১৫৮১ সালের এক সন্ধ্যায় এক বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে পেণ্ডুলাম আবিষ্কার করে ফেলেন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর। চিকিৎসা-শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করছেন ইটালির পিসা নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

একদিন গ্যালিলিও গেছেন স্থানীয় গীর্জায় উপাসনা করতে। হঠাৎই তাঁর নজরে পড়লো, গীর্জার একটা প্রকাণ্ড ঝাড়লণ্ঠন জোরালো বাতাসে এপাশ-ওপাশ দুলছে। কিছুক্ষণ সেই দুলুনি লক্ষ্য করে তাঁর মনে হলো, বাতিটা জোরেই দুলুক আর আস্তে দুলুক, একবার দুলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসতে সেটা প্রত্যেকবার একই সময় নিচ্ছে। সুতরাং গ্যালিলিও সময়টা মাপতে শুরু করলেন। কিন্তু কি করে মাপলেন? তাঁর সময়ে তো ঘড়ির আবিষ্কার হয়নি! ফলে এক অদ্ভুত কায়দায় সময়টা মেপেছিলেন গ্যালিলিও। ঝাড়লণ্ঠনের দুলুনির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে তিনি নিজের



নাড়ীর স্পন্দন গুণতে শুরু করলেন। এইভাবে মেপে প্রমাণ পেলেন, তাঁর অনুমানই ঠিক। দুলুনির মাপ বড় হোক আর ছোট হোক, প্রতিবার দুলতে ঝাড়বাতিটা একই সময় নিচ্ছে।

উপাসনার শেষে বাড়ি ফিরে এলেন গ্যালিলিও। দুটো একই মাপের সুতো যোগাড় করলেন। তারপর তাদের ডগায় বেঁধে দিলেন দুটো একই মাপের ওজন। এবার সুতো বাঁধা ওজন দুটোকে আলাদাভাবে ঝুলিয়ে দিলেন তিনি। একটা ওজনকে আস্তে, আর একটা ওজনকে জোরে দুলিয়ে নিজের নাড়ীর স্পন্দন গুণতে লাগলেন। দেখলেন, দুটো ওজনই এক সময় নিয়ে দুলছে। ব্যস, এইভাবে তৈরী হয়ে গেলো পৃথিবীর প্রথম পেণ্ডুলাম।

প্রথমে না বুঝতে পারলেও অনেক পরে গ্যালিলিও বুঝতে পেরেছিলেন পেণ্ডুলাম দিয়ে সময় মাপা সম্ভব, এবং তৈরী করা যাবে পেণ্ডুলাম-ঘড়ি। সেই সময়ে প্রচলিত ছিলো একরকম যান্ত্রিক ঘড়ি—যাতে একটা পড়ন্ত ওজন দিয়ে একটা কাঁটাকে নড়িয়ে সময় মাপা হতো। জল-ঘড়িতে যেমন জলের তলের উচ্চতা দেখে ঘণ্টা মাপা হতো, অনেকটা একই রকম নীতি ছিলো এই যান্ত্রিক ঘড়ির। ফলে এর সময়ের মাপ ততো নিখুঁত ছিলো না।

বৃদ্ধ বয়েসে পেণ্ডুলামের নীতিকে কাজে লাগিয়ে একটা ঘড়ির নক্সা তৈরী করলেন গ্যালিলিও। কিন্তু ১৬৪২ সালে ঘড়ি তৈরীর কাজ অসমাপ্ত রেখেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

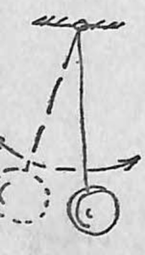
প্রায় চোদ্দ বছর পরে, ১৬৫৮ সালে, হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইগেন্‌জ্‌ তৈরী করলেন পেণ্ডুলাম-ঘড়ি। নিখুঁত সময়ের মাপ-এর যুগ শুরু হলো হাইগেন্‌জ্‌-এর এই 'পিতামহ ঘড়ি' থেকেই। ঘড়িটি তিনি উপহার দিয়েছিলেন হল্যাণ্ড সরকারকে।



একটা পেণ্ডুলাম কেন দোলে সেটা নিশ্চয়ই তোমরা

জানো? মাধ্যাকর্ষণ বা পৃথিবীর টান-ই পেণ্ডুলামের ঝুলন্ত ওজনটাকে ক্রমাগত দুলিয়ে যায়। যদি এই টান কমে যায়, তাহলে পেণ্ডুলাম অনেক ধীরে ধীরে দুলবে। যেমন, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ছ'ভাগের এক ভাগ। ফলে পৃথিবী থেকে কোন পেণ্ডুলাম-ঘড়ি চাঁদে নিয়ে গেলে ঘড়িটা 'স্লো' হয়ে যাবে।

মনে করা যাক, একটা সুতোর মাথায় ওজন বেঁধে একটা পেণ্ডুলাম তৈরী করা হলো। এবারে সেটা দুলিয়ে দেওয়া হলো এপাশ-ওপাশ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, ঝুলন্ত স্থির পেণ্ডুলামকে যদি এমনভাবে দোলানো হয়, যাতে সুতোটা খাড়া উলম্ব রেখার সঙ্গে দু-দিকেই মাত্র চার ডিগ্রি, বা তার কম কোণ তৈরী করে, একমাত্র তখনই পেণ্ডুলামের প্রত্যেকটি দোলনের সময় হুবহু একই থাকবে। সুতরাং, পেণ্ডুলাম তৈরী করে সেটা দোলানোর সময় এই কথাটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাবে, দুলতে দুলতে এক সময় আমাদের পেণ্ডুলাম একেবারে থেমে গেছে। তার কারণ, সুতোটা যেখানে বাঁধা থাকে সেখানকার ঘর্ষণ ও বাতাসের এলোমেলো ধাক্কা পেণ্ডুলামের দুলুনিকে বাধা দেয়। এই জন্যই, সাধারণতঃ যেসব দেওয়াল-ঘড়ি আমরা দেখি তাতে সুতোর বদলে ধাতব দণ্ড থেকে পেণ্ডুলামের ওজনটা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, আর সেই ধাতব দণ্ডকে এমনভাবে লাগানো হয়, যাতে সে খুব কম ঘর্ষণের মুখোমুখি হয়ে অতি সহজে দুলতে পারে। এছাড়া বাতাসের ধাক্কা থেকে পেণ্ডুলামের দুলুনিকে বাঁচানোর জন্য দেওয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলামকে কাঁচের বাক্সের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়।



বুদ্ধি মাপে কেমন করে

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, সব মানুষের বুদ্ধি সমান হয় না। হেরফের থেকে যায় কম-বেশি। যেমন, রামের বুদ্ধি হয়তো শ্যামের চেয়ে বেশি, আবার শ্যাম হয়তো যদুর চেয়ে চালাক। সুতরাং, কার বুদ্ধি কম, কার বুদ্ধি বেশি সেটা বোঝা যাবে কেমন করে? আমরা সাধারণতঃ কোন কাজের ফলাফল দেখে কারো বুদ্ধি আঁচ করি। উদাহরণ স্বরূপ, মনে করো, একটা অঙ্ক একই ক্লাসের এবং একই বয়েসের দুজন ছেলে কষতে আরম্ভ করলো। একজন অঙ্কটা করতে পারলো, আর একজন পারলো না। তখন আমরা বলবো, যে অঙ্কটা পারলো, তার বুদ্ধি দ্বিতীয় জনের চেয়ে বেশি। কিন্তু তার বুদ্ধি যে কতোটুকু সেটা বলা কি সম্ভব? বুদ্ধি কি মাপা যায় নিখুঁতভাবে?

১৯০০ সালের আগে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুজে পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানীরা নানানভাবে বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামালেও একমত হয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি তাঁরা। অবশেষে ফরাসী দেশের এক মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনে সঠিকভাবে দেখিয়ে দিলেন বুদ্ধি মাপার পথ।



বিনে এবং তাঁর সহকারীরা কতকগুলো বিশেষ ধরণের পরীক্ষা তৈরী করলেন, যাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বলা হতো, কয়েকটা জিনিস দেখে তাদের নামকরণ করতে, কোন নকশা দেখে সেটা নকল করতে, অথবা এলোমেলো কতকগুলো জিনিসকে নিয়ম মাফিক সাজিয়ে দিতে, এইরকম আরো কতো কি!!

বুদ্ধি মাপার এইরকম বহু পরীক্ষা বিনে প্রথম প্রকাশ করলেন ১৯০৫ সালে, তারপর দ্বিতীয় দফায় আবার ১৯০৮

সালে। পরীক্ষাগুলো অল্পদিনেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। ক্রমে ফ্রান্স থেকে সেগুলো ছড়িয়ে পড়লো অন্যান্য দেশে। ১৯১১ সালে আলফ্রেড বিনে প্রয়াত হলেও তাঁর পরীক্ষা-গুলোর গুরুত্ব আজও কমেনি।

আলফ্রেড বিনের পরীক্ষার মাধ্যমে কোন মানুষের 'মানসিক বয়েস' হিসেব করে বের করা হয়—আর সেটাই হয় তার বুদ্ধির মাপ।

মনে করা যাক, বিনের পদ্ধতিতে কোন ছেলের মানসিক বয়েস বের করা হলো; দেখা গেলো, সেটা দশ বছর। ধরো, দ্বিতীয় আর একটি ছেলের বেলাতেও একই পরীক্ষায় ফল পাওয়া গেলো দশ বছর। তাহলে আমরা বলবো দুটো ছেলেরই বুদ্ধি সমান—অর্থাৎ, মানসিক বয়েস একই : দশ বছর। কিন্তু এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে দুজনের মধ্যে কে বেশি বুদ্ধিমান? হয়তো না। কারণ ছেলে দুটির আসল বয়েস না জানলে সেটা বলা সম্ভব নয়।

ধরা যাক, প্রথম ছেলেটির বয়েস ছিলো চোদ্দ বছর, আর দ্বিতীয় জনের বয়েস ছিলো আট বছর। তাহলে এখন নিশ্চয়ই আমরা বলতে পারি, আট বছরের ছোট ছেলেটি চোদ্দ বছরের ছেলেটির তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান। কারণ, মাত্র আট বছর বয়েসেই তার বুদ্ধি চোদ্দ বছর বয়েসী ছেলের বুদ্ধিতে পৌঁছে গেছে।



এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বিনের পদ্ধতিতে বুদ্ধি মাপা সম্ভব, কিন্তু তার তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব নয়। এরকম বিচার করতে গেলে মানসিক বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আসল বয়েসটাও জানতে হবে আমাদের। সুতরাং এইসব বিষয় নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে মনোবিজ্ঞানীরা এমন একটা পথ বের করলেন যাতে বুদ্ধির মাপ হিসেব করতে গেলে মানসিক বয়েসের সঙ্গে আসল বয়েসটাও জুড়ে দেওয়া

যায়। তার ফলে, কে কার চেয়ে কতোটা বেশি বুদ্ধিমান তার একটা তুলনামূলক মান পাওয়া যায়। এই আধুনিক পদ্ধতিতে বুদ্ধির যে মাপ পাওয়া যায়, তাকেই বলা হয় ইনটেলিজেন্স কোশেণ্ট, অথবা সংক্ষেপে, শুধু আই. কিউ.।

আই. কিউ. শব্দটা নিশ্চয়ই তোমাদের খুব জানা। কথায় কথায় বলা হয়, কারো আই. কিউ. ৯০, কারো বা ১২০, এমনতরো আরো কতো সংখ্যা। এই সংখ্যা যার ক্ষেত্রে যতো বেশি, সে যে ততো বেশি বুদ্ধিমান, এ খবরটাও হয়তো তোমরা অনেকেই রাখো। কিন্তু আই. কিউ.-র সংখ্যাটা কিভাবে হিসেব করে বের করা হয় সেকথা জিজ্ঞেস করলে তোমরা বোধহয় মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করে দেবে। তাহলে এসো, এই হিসেবের কায়দাটা খুব সহজে একটু খতিয়ে দেখা যাক।

আই. কিউ. জিনিসটা শুধুই একটা সংখ্যা, এবং এটা বের করা হয় মানসিক বয়েসকে আসল বয়েস দিয়ে ভাগ করে, সেই ভাগফলকে একশো দিয়ে গুণ করে। অর্থাৎ,

$$\text{আই. কিউ} = \frac{\text{মানসিক বয়েস}}{\text{আসল বয়েস}} \times ১০০$$

সুতরাং, একটু আগে যে ছেলে দুটির বুদ্ধি আমরা মেপেছিলাম, তাদের আই. কিউ. কতো হবে সেটা সামান্য অঙ্ক কষে বের করা যাক।

প্রথম ছেলেটির মানসিক বয়েস দশ বছর ও আসল বয়েস চোদ্দ বছর।

অতএব তার আই. কিউ. $= \frac{১০}{১৪} \times ১০০ = ৭১$

একইভাবে হিসেব করলে দ্বিতীয় ছেলেটির আই. কিউ. দাঁড়াবে ১২৫।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে দ্বিতীয় জন প্রথম জনের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।



যদি কারো মানসিক বয়েস আর আসল বয়েস হুবহু সমান হয়, তাহলে তার আই. কিউ. কতো হবে বলো দেখি? হ্যাঁ, ঠিকই আন্দাজ করেছো, পুরোপুরি ১০০। কারণ, কোন দশ বছর বয়েসের ছেলের মানসিক বয়েসও যদি দশ বছর হয়, তাহলে তার আই. কিউ. $= \frac{১০}{১০} \times ১০০$ $= ১০০$।

কতো আই. কিউ. হলে বুদ্ধি কিরকম হয়, তার একটা মোটামুটি হিসেব দিলাম তোমাদের সুবিধের জন্যে।

আই. কিউ.	বুদ্ধি
১। একশো চল্লিশ বা তার ওপরে	শতকরা একজন এইরকম প্রতিভাধর হয়
২। একশো কুড়ি থেকে একশো উনচল্লিশ	অত্যন্ত বুদ্ধিমান। শতকরা দশজন পাওয়া যায়।
৩। একশো দশ থেকে একশো উনিশ	মোটামুটি বুদ্ধিমান। শতকরা ষোলজন দেখা যায়।
৪। নব্বই থেকে একশো নয়	সাধারণ। শতকরা ছেচল্লিশজন দেখা যায়।
৫। সত্তর থেকে উননব্বই	সাধারণের চেয়ে বোকা। শতকরা চব্বিশ জন।
৬। সত্তরের নীচে	মানসিকভাবে অসুস্থ। শতকরা তিনজন।



মানসিক বয়েস

যাদের আই. কিউ. ১০০, তাদের আমরা সাধারণ বুদ্ধির মানুষ বলি। আই. কিউ. একশোর কম হলে, তার বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে কম, আর একশোর বেশি হলে সাধারণ বুদ্ধির মানুষের চেয়ে তার বুদ্ধি হবে বেশি।

একটা খবর তোমাদের বলতে পারি, তবে শুনলে হয়তো প্রথমে খুবই দুঃখ পাবে। পনেরো থেকে আঠারো বছরের পর আমাদের বুদ্ধি আর একটুও বাড়ে না—একই থেকে যায়। বিশ্বাস করো, পরীক্ষা করে এই সত্যিটা অনেক দুঃখের সঙ্গেই প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে বিশেষ মনমরা হওয়ার কারণ নেই। কারণ, যেটুকু বুদ্ধি হওয়ার সেটুকু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াটাই আমাদের পক্ষে ভালো। তাহলে সেই বুদ্ধি নিয়ে বাকি জীবনটা আমরা কাজ করার সুযোগ পাবো। ধরো, পনেরো বছরে একজনের বুদ্ধি একদম শেষ ধাপে পৌঁছে গেলো। তারপর আর বাড়লো না। কিন্তু আর একজনের বুদ্ধি সময় নিলো পনেরো বছরের বদলে পঞ্চাশ বছর! অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর ধরে খুব ধীরে ধীরে বেড়ে চললো। তাহলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির মাপ সমান হলেও প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বুদ্ধিতে টেক্কা দিয়ে যাবে সারা জীবন ধরেই। সুতরাং তাড়াতাড়ি বুদ্ধি বেড়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে সবদিক দিয়েই ভালো।

এই কারণে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি ঠিক করেছেন, কারো বয়েস পনেরো বছর পেরিয়ে গেলেও আই. কিউ. হিসেব করার সময় তার বয়েস পনেরো বলেই ধরা হবে। অর্থাৎ, কোন চল্লিশ বছরের মানুষের মানসিক বয়েস যদি পনেরো হয়, তাহলে তার আই. কিউ. হবে,

$$\text{আই. কিউ} = \frac{১৫ \times ১০০}{১৫} = ১০০$$



অর্থাৎ, তার আসল বয়েস চল্লিশ না ধরে পনেরো বছর ধরেই সমস্ত হিসেব করতে হবে।

ব্যাস. এবার তো সব জেনে গেলে আই. কিউ. সম্পর্কে! এখন তোমরা সহজেই নিজেদের আই. কিউ. বের করতে পারবে, যদি মানসিক বয়েসটা কোন পরীক্ষার মাধ্যমে আগে বের করতে পারো। মনে রাখবে, এই মানসিক বয়স মাপার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা প্রচলিত আছে। আলফ্রেড বিনের পর অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা এ ধরণের আরো অনেক নতুন নতুন পরীক্ষা তৈরি করেছেন। সেই সব পরীক্ষা প্রয়োগ করে বেশ সুফলই পাওয়া গেছে।



পৃথিবী কেমন দেখতে

তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমাদের পৃথিবীটা কেমন দেখতে, তাহলে উত্তর দিতে কোন অসুবিধেই তোমাদের হবে না। শুধু তোমরা কেন, ছোট বড় সকলেই হয়তো চটপট জবাব দিয়ে ফেলবে এই প্রশ্নের। বলবে, 'পৃথিবী গোল, এবং উত্তর-দক্ষিণে সামান্য চাপা—ঠিক একটা কমলা-লেবুর মতো।'

উত্তরটা যে নির্ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এরপর যদি আমি বলি, পৃথিবী যে গোল সেটা প্রমাণ করে দিতে পারো? তাহলে কিন্তু তোমরা বেশ মুশকিলে পড়ে যাবে। মাথা চুলকে প্রমাণ খুঁজতে শুরু করবে। তারপর নানান চিন্তাভাবনার পর হাতের কাছে যুৎসই কোন প্রমাণ খুঁজে না পেয়ে হয়তো বলে বসবে, 'কেন, সব বইতে লেখা আছে পৃথিবী গোল!'

কথাটা সত্যি। কিন্তু মনে করো, যদি কোন বইয়ে এই কথাটা লেখা না থাকতো, তাহলে? তখন তুমি-আমি সকলেই বেশ ঘোরতর সমস্যায় পড়ে যেতাম, তাই না?

ঠিক একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলো খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মানুষেরা। তাদের হাতের কাছে সরাসরি এমন কোন প্রমাণই ছিলো না, যা থেকে বলা যায় পৃথিবী গোল। তাদের রাজত্ব চলতো যেটুকু এলাকা জুড়ে, তারা ভাবতো পৃথিবী বলতে শুধু সেটুকু জায়গাই বোঝায়।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আসিরীয় রাজত্বের পতন হলো। এই রাজত্বের স্বর্ণযুগে সেটা ছড়িয়ে পড়েছিলো মিশর থেকে ব্যাবিলোনিয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় চোদ্দশো মাইল। এরপর এলো পারস্য রাজত্ব, যার বিস্তৃতি ছিলো তিন হাজার মাইল।

সুতরাং পৃথিবী বলতে সেখানকার লোকেরা ঐ তিন হাজার মাইল ব্যাপী এলাকাটুকুই বুঝতো। তারা নিজেদের দেশে নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতো। পৃথিবীটা কতো বড়, সেটা আঁচ করার চেষ্টায় কোন মাথাব্যথা তাদের ছিলো না। তবে তখনকার পর্যটকরা বা সৈনিকরা গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর পাড়ি দিয়ে যখন রাজত্বের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যাতায়াত করতো, তখন বুঝতে পারতো, তাদের দেশের সীমারেখাই পৃথিবীর সীমারেখা নয়। তার ওপারেও সবুজ বন, ধূ-ধূ প্রান্তর বিস্তৃত রয়েছে, যা তাদের অজানা।

এইসব দেখে শুনে তখনকার মানুষের মনে একটা সহজ প্রশ্ন জেগে ওঠা খুব স্বাভাবিক: পৃথিবীর কি কোন শেষ নেই? হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষ বেরিয়ে পড়েছিলো দিকে দিকে। কিন্তু অবশেষে সে বাধা পেয়েছে সমুদ্রের তীরে এসে। কেউ কেউ সাহস করে জাহাজে চড়ে ভেসে পড়েছে অকূল সাগরের বুকে। কিন্তু না, পৃথিবীর শেষ মানুষ খুঁজে পায়নি।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ধারণা হলো, পৃথিবী থালার মতো চ্যাপ্টা। আর সেই বিশাল থালার বুকে রয়েছে বাড়ি-ঘর, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, সবকিছু। এটাই হলো পৃথিবীর চেহারা সম্পর্কে সবচেয়ে পুরনো ভাবনা।

এই ভাবনাটুকুর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হলো নতুন কিছু সমস্যার।



পৃথিবী যদি থালার মতোই হয় তাহলে সেই থালার নিশ্চয়ই একটা শেষ থাকবে। সুতরাং, কোথায় সেই শেষ, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু করলো মানুষ। কারণ, কোন জিনিসের আকার 'অসীম', 'অনন্ত,' 'এতো বড় যে মাপা যায় না,' কিংবা 'শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না,'

এইরকম কোন উত্তরে মানুষ কোনদিনও খুশি হয়নি। তখনও না, আজও নয়। অতএব তারা ঠিক করলো, পৃথিবীর শেষ থাকতেই হবে।

শেষ যদি সত্যিই থাকে, তাহলে এক নতুন বিপদ দেখা দিলো তখনকার মানুষের কাছে। তারা ভাবলো, 'পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়ে, অর্থাৎ, সেই থালার কিনারায় গিয়ে আমরা পড়ে যাবো না তো?'

কিন্তু চিন্তা করে দেখা গেলো, না, সেরকম কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ পৃথিবী চারিদিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। এর ফলে পথচারীরা হয়তো রক্ষা পেলো, কিন্তু নাবিকদের ভয় গেলো বেড়ে। তারা ভাবলো, ডাঙা ছেড়ে বেশি দূর সমুদ্রে পাড়ি দিলেই তারা বুঝি থালা থেকে পড়ে যাবে নিচে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অবশ্য 'নিচে' বলতে ঠিক কোথায়, তা তারা জানতো না। ভাবতে হয়তো তোমাদের অবাক লাগবে, তাদের এই আশঙ্কা বজায় ছিলো পনেরো শো শতাব্দীতে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সময় পর্যন্ত। যদিও ততোদিনে, পৃথিবীর আকার যে ফুটবলের মতো গোল, সেকথা আঠেরো শো বছরের পুরোনো হয়ে গেছে মানুষের কাছে।

যদি আমরা ফিরে যেতাম সেই অজ্ঞানতার যুগে, তাহলে সমুদ্রে ঘেরা থালার মতো পৃথিবীর অসুবিধেটা হয়তো খুব সহজেই বুঝতে পারতাম। আর সেই কারণেই প্রশ্ন তুলতাম, 'সমুদ্রের বিপুল জলরাশিকে পৃথিবীর চারদিকে ধরে রেখেছে কে? থালার কিনারা দিয়ে সেই জল জলপ্রপাতের মতো কেন ঝরে পড়ছে না অতলে?'

এই প্রশ্ন তখনকার মানুষেরাও তুলেছিলো। তারা ভাবলো, সত্যিই যদি ঝরে পড়তো সাগরের জল, তাহলে কবেই তো শুকিয়ে যেতো অতল সমুদ্র। কোন জল থাকতো না এই পৃথিবীতে। পৃথিবীর বুক জোড়া থাকতো শুধু রুক্ষ মরুভূমির রাজত্ব। তা যখন হয়নি, তখন



পৃথিবীর চেহারা অনুমান করতে গিয়ে নিশ্চয়ই হিসেবে কোন ভুল থেকে গেছে মানুষের।

এই ভুল শোধরাতে গিয়ে মানুষ কল্পনা করে নিলো, মাথার ওপরের আকাশটা কোন কঠিন পদার্থের তৈরি। অনেকটা ওল্টানো বাটির মতো। আর আকাশের কঠিন কিনারা নেমে এসে মিশে গেছে থালার মতো পৃথিবীর কিনারায়। সব মিলিয়ে আমাদের জগতটা একটা নিঃশ্ছিদ্র খাঁচার মতো। যেখানে ছাদ ও চারপাশের দেওয়াল হচ্ছে আকাশ, আর থালার মতো মেঝেতে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন দেশ, সমুদ্র, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী।

এই থালার আকৃতি সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষের ধারণা ছিলো, সেটা গোল নয়, বরং চৌকো, অনেকটা আয়তক্ষেত্রের মতো। যার দৈর্ঘ্য হলো পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ও প্রস্থ উত্তর-দক্ষিণে। এই ধারণার কারণ, ইতিহাস ও ভূগোলের এমনই মায়া যে নীল নদ, টাইগ্রীস-ইউফ্রেতিস ও সিন্ধু নদের তীরে যে সব সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো, তারা ছড়িয়ে পড়েছিলো পূবে-পশ্চিমেই বেশি—উত্তর-দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত কম। তার ওপরে ভূমধ্যসাগরও তার বিপুল জলরাশির রাজত্ব বিস্তার করেছে পূর্ব এবং পশ্চিমে।

গ্রীকরা কিন্তু সাধারণ ধারণার স্বপক্ষে না গিয়ে থালাটাকে গোলাকার বলে ভাবতো। কারণ, জ্যামিতি শাস্ত্রে তাদের জ্ঞান অনেক বেশি ছিলো, জ্যামিতিক অনুপাত সম্পর্কে ধারণাও ছিলো জোরালো। ফলে তারা সিদ্ধান্ত নিলো, পৃথিবী থালার মতো গোল, এবং গ্রীস দেশ সেই থালার কেন্দ্রে অবস্থিত। থালার কিনারা যথারীতি সমুদ্রে ঘেরা, ও সেই সমুদ্র ভূমধ্যসাগরের রূপ ধরে বয়ে এসেছে থালার কেন্দ্রের দিকে। তবে এই থালার ক্ষেত্রফল, বা মাপ সম্পর্কে কোন অনুমান তখনও করা সম্ভব হয়নি।



খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পৌছে মানুষের ধারণা হলো, এই গোল থালার মতো পৃথিবীর ব্যাস বড় জোর পাঁচ হাজার

মাইল। এই ধারণার যিনি জন্মদাতা, তিনি হলেন মিলেটাস-এর দার্শনিক হেকাটিয়াস। জাতে গ্রীক অবশ্যই, এবং সম্ভবত প্রথম বৈজ্ঞানিক ভুগোলবিৎ। হিসেব করলে হেকাটিয়াসের থালা-পৃথিবীর ক্ষেত্রফল খুব সহজেই বের করা যেতে পারে, এবং সেটা হলো প্রায় দু-কোটি বর্গমাইল। স্পষ্টই বোঝা যায়, সেই সময়ের মানুষের কাছে এটা ছিলো একটা সুবিশাল এলাকা, আর জায়গাটা মানুষের প্রয়োজনের চেয়েও অনেক অনেক বড় ছিলো। কিন্তু শুনলে হয়তো অবাক হবে, সাম্প্রতিক মাপজোপে ভূপৃষ্ঠের যে ক্ষেত্রফল পাওয়া গেছে তা প্রায় বিশ কোটি বর্গমাইল!

পৃথিবীর চেহারার সমস্যা মিটলেও একটা বড় সমস্যার দিকে মানুষ তখনও নজর দেয়নি। থালার মতো পৃথিবীটাকে আকাশ সমেত কে ভাসিয়ে রেখেছে শূন্যে? কি আছে পৃথিবীর নিচে? সকলেই তখন জানতো, ভারী জিনিস মাত্রই নিচের দিকে এসে পড়ে। তবে মনে রাখবে, এই প্রসঙ্গে আকাশের চন্দ্র-সূর্যের নিচে খসে পড়ার কথা চিন্তা করাটাও ছিলো ভয়ংকর পাপ—অন্তত সেই যুগে। কারণ তখনকার মানুষের কাছে সেগুলো ছিলো 'স্বর্গীয় বস্তু,' তাই অনায়াসে অলৌকিকভাবে ভেসে থাকতে পারে আকাশে। সুতরাং আমাদের সাধের পৃথিবীটা কেন খসে পড়ছে না নিচের দিকে, সেই কথাটাই তখন সবাই ভাবতে শুরু করলো।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ভারতীয় পুরাণে উল্লেখ রয়েছে সহস্র-ফণা সর্পরাজ বাসুকী আমাদের এই বসুন্ধরাকে বহন করে রেখেছেন তাঁর মাথায়। তাঁর পরিশ্রমের কোন বিরাম নেই, কোন বিকল্প নেই। একমাত্র কৃষ্ণসখা অর্জুন তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য ভারমুক্ত করেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন তখন অন্যান্য সব রাজার মতো সর্পরাজও আমন্ত্রিত হন। কিন্তু নিজের গুরুদায়িত্ব ছেড়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে বসুন্ধরাকে বহন করবে কে? সুতরাং তিনি সবিনয়ে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে জানালেন নিজের অক্ষমতার



কথা। তখন অর্জুন বসুন্ধরার ভার নিজের ধনুক গাণ্ডীবের ওপর তুলে নিয়ে সর্পরাজকে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দেন।

অন্যান্য পুরাণ ও কথিকায় শোনা যায় এরকমই বিচিত্র আরো কাহিনী। তিনটি বিশাল তিমি মাছ নাকি ধরে রেখেছে আমাদের পৃথিবীকে। তিমি মাছগুলোকে কে ধরে রেখেছে তার উত্তর অবশ্য কেউ জানে না। আবার কোথাও বলা আছে বিশাল চারটে স্তম্ভের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী। স্তম্ভগুলো কিসের ওপর রয়েছে? কেন, চারটে হাতির ওপর! আর হাতিগুলো? এক প্রকাণ্ড কচ্ছপের পিঠে। এই কচ্ছপই হয়তো ভগবান কৃষ্ণের কূর্ম অবতারের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু তাহলেই প্রশ্ন জাগে, সেই কচ্ছপ বেচারি রয়েছে কোথায়? সে নাকি সাঁতার কেটে চলেছে এক অনন্ত সমুদ্রের জলে! তাই যদি হয়, তাহলে সেই অনন্ত সমুদ্র কোথায়?

সুতরাং এই প্রশ্নের শেষ নেই!

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে পৃথিবীকে চ্যাপ্টা থালার মতো ভাবার ফলে সমস্যার পর সমস্যা এসে বিব্রত করতে শুরু করলো মানুষকে। এবং সেসব সমস্যার সমাধান তখনও কেউ করে উঠতে পারে নি।

পৃথিবী যে থালার মতো নয়, তার প্রথম ইশারা বয়ে নিয়ে এলো রাতের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রেরা।

বিভিন্ন পর্যটকরা লক্ষ্য করলো, উত্তর দক্ষিণে মাইলে পর মাইল অতিক্রম করলে সামনের দিগন্ত-রেখা থেকে নতুন নতুন নক্ষত্র ক্রমশই জন্ম নেয় ও পিছনের দিগন্তে ডুবে যায় অসংখ্য নক্ষত্র। এর কারণ একটাই হতে পারে: পৃথিবীটা উত্তর-দক্ষিণে কোন গোলকের তলের মতোই বেঁকে গেছে। একই ধরণের পরীক্ষা কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমে সফল হয়নি। তার কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো? সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা সমেত গোটা আকাশটাই যে অবিরাম পূব থেকে পশ্চিমে ঘুরে



চলেছে! আসলে পৃথিবী নিজেই যে ঘুরছে সেটা তখনকার মানুষ জানতো না। এইভাবে ঘুরে একটা পাক সম্পূর্ণ করতে চাঁদ-তারার সময় লাগে চব্বিশ ঘণ্টা—অর্থাৎ,একদিন।

এই পরীক্ষার ভিত্তিতে মিলেটাস-এর গ্রীক দার্শনিক আনাক্সিমান্দার আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৫৫০ সালে বলেছিলেন, 'না, থালার মতো নয়। পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে বাঁকা একটা চোঙের মতো দেখতে।'

চোঙটার একটা মাপও দিলেন তিনি। বললেন, 'চোঙের গোলাকার অংশের ব্যাস তার বেধ-এর তিনগুন।' অর্থাৎ, সোজা কথায়, একটা খাড়া চাকতি।

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখো, আনাক্সিমান্দারই প্রথম গোটা পৃথিবীর একটা মানচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছিলেন, এবং পরে তাঁর এই অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন হেকাটিয়াস।

আনাক্সিমান্দারের চাকতি পৃথিবীও মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

তার কারণ, সমুদ্রের তীরে যারা বাস করতো কিংবা সমুদ্রযাত্রায় যারা অভ্যস্ত ছিলো, তাদের অভিজ্ঞতা ছিলো অন্যরকম। তারা দেখতো, সমুদ্রে ভেসে যাওয়া জাহাজগুলো দূরে যেতে যেতে ক্রমশ ছোট ফুটকির আকার নিয়ে তারপর অদৃশ্য হতো না, বরং বেশ স্পষ্ট এবং মোটামুটি আকার থাকতে থাকতেই ধীরে ধীরে নেমে যেতো দিগন্ত রেখার ওপারে; যেন কোন পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে জাহাজটি: প্রথমে অদৃশ্য হচ্ছে তার খোল, তারপর পাল, অবশেষে মাস্তল।



এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট: পৃথিবী সমতল নয়। তখনকার মানুষ এটা জানতো ভালো করেই। কিন্তু অবাক হয়ে তারা আবিষ্কার করলো, জাহাজের এই অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হওয়ার ঘটনাটা ঘটছে চারদিকেই—আনাক্সিমান্দারের মতবাদ অনুযায়ী শুধুমাত্র উত্তর-দক্ষিণে নয়! সুতরাং এর অর্থ একটাই

হতে পারে : পৃথিবীর পৃষ্ঠতল ঠিক একটা গোলকের মতো সবদিকেই সমানভাবে বেঁকে গেছে।

এইরকম গোলকধাঁধায় আরও কিছুদিন কেটে গেলো মানুষের। তারপর গ্রীক দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষরা চন্দ্র-গ্রহণের একটা কারণ বের করে ফেললেন। তাঁরা বললেন, চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্যের আলো পৃথিবীর ছায়া ফেলে চাঁদের ওপর। সেই ছায়া রাহু হয়ে ধীরে ধীরে গ্রাস করে চাঁদকে—তারপর একসময় আবার মুক্তি দেয়। তখন শেষ হয় গ্রহণের ঘটনা।

উত্তর-গ্রীসের প্রখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল গ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, সেটা যেন গোলাকার বৃত্তেরই একটা অংশ। একটু ভেবে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে, কেবলমাত্র একটি বিশেষ জিনিসের ছায়াই সব সময় গোলাকার হয়, এবং সেই বস্তুটি হলো গোলক। সুতরাং বৃত্তাকার ছায়া ফেলছে যে পৃথিবী তাকেও দেখতে নিশ্চয়ই গোলকের মতো! তাহলে খালি চোখে ভূপৃষ্ঠকে সমতল মনে হয় কেন? তার কারণ, পৃথিবীটা এতো বড় যে খালি চোখে তুমি-আমি তার যতোটুকু দেখতে পাই তাতে তার বক্রতা ধরা পড়া সম্ভব নয়।

অ্যারিস্টটল-এর এই মতামতের প্রায় একশো বছর আগে, খ্রীস্টপূর্ব চারশো পঞ্চাশ সালে, আর একজন গ্রীক দার্শনিক টারেণ্টাম-নিবাসী ফিলোলস কিন্তু বলেছিলেন, পৃথিবী গোলাকার, এবং সেটা দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে।



সুতরাং অ্যারিস্টটল-এর কথাতেই মানুষ মোটামুটি সিদ্ধান্তে পৌছলো, পৃথিবী গোল। তাই যদি হয়, তাহলে এবারে আর তার সীমানা নিয়ে কোন গোলমাল রইলো না। কারণ কোন গোলকের ক্ষেত্রফল নির্দিষ্ট হলেও, তার কোন সীমারেখা নেই। অর্থাৎ, বলা যায় 'অ-সীম'। উদাহরণ স্বরূপ, একটা ফুটবলের সীমারেখা বের করার

চেষ্টায় তোমরা আদা-জল খেয়ে লেগে যেতে পারো, কিন্তু সীমানা যে খুজে পাবে না, সেকথা তিন-সত্যি করে আগে থেকেই বলে দেওয়া যায়।

পৃথিবীর চেহারার প্রশ্ন মিটে গেলেও আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর বাকি থেকে গিয়েছিলো। সেটা হলো, পৃথিবীটা নিচে পড়ে যাচ্ছে না কেন ?

উত্তরে অ্যারিস্টটল-ই আবার এগিয়ে এলেন পুরোভাগে। বললেন, 'নিচের দিক বলতে নির্দিষ্ট কোন দিক নেই। আমাদের পায়ের দিকটাই হচ্ছে নিচের দিক—অর্থাৎ যে দিকটা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিক নির্দেশ করছে। সুতরাং প্রাকৃতিক রীতি অনুযায়ী সব জিনিসই পড়তে চেষ্টা করে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে। এমনকি পৃথিবী নিজেও সেই চেষ্টা থেকে রেহাই পায় না। ফলে পৃথিবীটা যতোটা "নিচে" পড়ে যাওয়া সম্ভব ততোটা পড়ে গিয়ে সুস্থির হয়ে রয়েছে। সোজা কথায়, আঁটোসাঁটো হয়ে রয়েছে নিজের কেন্দ্রকে ঘিরে। তার ফলে আর নিচে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই।'

এই বক্তব্যের মধ্যে তোমরা কেউ কেউ হয়তো খুব সঙ্গত কারণেই পৃথিবীর টান, অভিকর্ষ, বা মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আভাস পেয়ে অবাক হতে পারো। কারণ অ্যারিস্টটল-এর সময়ে মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে কোন ধারণাই মানুষের ছিলো না। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সূত্র ও তার ব্যাখ্যা স্যার আইজাক নিউটন পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন এই ঘটনারও প্রায় দু-হাজার বছর পরে!

অতএব খ্রীষ্টপূর্ব তিনশো পঞ্চাশ সালেই সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো যে পৃথিবী গোলাকার। আর এও জানা গেলো, কেমন করে সে শূন্যে ভাসছে।

এই অনুমানের ওপর নির্ভর করে অন্যান্য সমস্ত প্রাকৃতিক হিসেব মোটামুটি মিলে যাওয়ায় মানুষ ধরে নিলো, যে এ অনুমানই সত্যি। যদিও সরাসরি কোন প্রমাণ তখনও মানুষ পায়নি। এই প্রমাণ পেতে পৃথিবীবাসীকে অপেক্ষা



করতে হয়েছিলো আরো আঠেরো শো বছর!

ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাজিলান নামে জনৈক পর্তুগীজ অভিযাত্রী ১৫১৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর পাঁচটি জাহাজ নিয়ে রওনা হলো স্পেনের বন্দর ছেড়ে। উদ্দেশ্য কলম্বাসের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা: গোটা পৃথিবীকে সমুদ্রপথে একটা চক্কর দিয়ে আসা, এবং সরাসরি প্রমাণ করা পৃথিবী গোল।

কিন্তু প্রায় তিন বছর পরে, সেপ্টেম্বর মাসের আট তারিখে পাঁচটি জাহাজের মাত্র একটি ফিরে এলো স্পেন-এর সেভিল বন্দরে। জাহাজটির নাম 'ভিক্টোরিয়া'। উনিশ জন দুর্ভিক্ষপীড়িত রুগ্ন কঙ্কালসার মানুষ নেমে এলো সেই জাহাজ থেকে। জানা গেলো, দলনেতা ম্যাজিলান নিহত হয়েছে ফিলিপাইন্স-এর অসভ্য উপজাতির হাতে। কিন্তু প্রথম পৃথিবী পরিক্রমার অভিযান সফল হলো। পাওয়া গেলো বহু প্রতীক্ষিত সরাসরি প্রমাণ।

কিন্তু এর পরেও পৃথিবীর চেহারা পাল্টালো। কারণ, স্যার আইজ্যাক নিউটন বিপ্লব ঘটালেন মানবজাতির জীবনে। আবিষ্কার করলেন মাধ্যাকর্ষণ সূত্র। তিনি বললেন, প্রত্যেক জিনিসকেই পৃথিবী নিজের কেন্দ্রের দিকে টানে। কিন্তু কোন্ জিনিসকে সে কতো জোরে টানবে, সেটা নির্ভর করবে জিনিসটার ভর এবং পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে জিনিসটা কতো দূরে রয়েছে তার ওপর। দূরত্ব কমে গেলে মাধ্যাকর্ষণ বল বাড়ে, এবং দূরত্ব বাড়লে এই বল কমে যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মাধ্যাকর্ষণ বল মেপে দেখলেন বিজ্ঞানীরা, এবং ভারী অদ্ভুত ফলাফল পেলেন সেই পরীক্ষায়। পৃথিবী সত্যি গোলাকার হলে, মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর সব জায়গায় সমান হওয়ার কথা। কিন্তু তাঁরা দেখলেন, সেটা সমান নয়। মেরু-অঞ্চলে এই বল সবচেয়ে বেশি, আর বিষুবরেখা-অঞ্চলে সবচেয়ে কম!



নিউটনের সূত্রের সাহায্যে এই বিচিত্র ফলাফলের ব্যাখ্যা পাওয়া গেলো খুব সহজেই : পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে মেরু-অঞ্চলের দূরত্ব নিশ্চয়ই কম, তাই মাধ্যাকর্ষণ বল বেশি ; আর বিষুবরেখা-অঞ্চলের দূরত্ব বেশি, তাই মাধ্যাকর্ষণ বলও কম। অর্থাৎ, পৃথিবীর চেহারা বিষুবরেখা বরাবর পেটমোটা কমলালেবুর মতো—আর মেরুর দিকে সামান্য চাপা। ফলে সব মিলিয়ে জন্ম নিলো কমলালেবু-পৃথিবী।

এতোগুলো সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখে তোমরা নিশ্চয়ই অনেকটা মনের জোর ফিরে পেয়েছো। আর সেই জন্যেই হয়তো বলে বসবে, 'প্রথমেই তো বললাম, পৃথিবীটা দেখতে ঠিক কমলা-লেবুর মতো—উত্তর-দক্ষিণে সামান্য চাপা!'

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। শুরুতে এটাকেই আমরা নির্ভুল উত্তর বলে মেনে নিয়েছি। কারণ, সত্যিই আমরা জানতাম, বিষুবরেখা বরাবর পৃথিবীর ব্যাস সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর রকেট-যুগের গবেষণা আমাদের এই ধারণাও দিয়েছে পালটে। মহাকাশ যুগের মানুষ বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ অবলীলায় উড়িয়ে দিলো মহাশূন্যে। তারা আকাশ থেকে তুলে নিয়ে এলো পৃথিবীর নানান ছবি। সেই ছবি নিজের চোখে দেখে মানুষ তার ভুল স্বীকার করেছে। না, কমলালেবুর মতো নয়, পৃথিবীকে দেখতে অনেকটা নাশপাতির মতো। কারণ, দেখা গেছে, পৃথিবীর পেটমোটা অংশটা ঠিক বিষুবরেখা বরাবর নয়, বরং রয়েছে তার অনেকটা নিচে। অর্থাৎ, দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে। সুতরাং আজ পর্যন্ত শেষ কথা হলো, কমলালেবু-পৃথিবী নয়, নাশপাতি-পৃথিবী।

হিসেব করলে দেখা যাবে, প্রাচীন মানুষের চ্যাপ্টা থালার মতো পৃথিবীটা বর্তমানকালের নাশপাতির চেহারা নিতে সময় নিয়েছে মোটামুটিভাবে তেইশ শো বছর!



এ থেকেই বোধহয় বুঝতে পারছো, পৃথিবী চেনার ব্যাপারটা ততো সহজ কাজ ছিলো না!

মানুষ যদি দৈত্য হতো



অনেক কল্পবিজ্ঞানের গল্পে তোমরা হয়তো পড়ে থাকবে, কোন একটা ওষুধ খেয়ে বা ইনজেকশান নিয়ে কোন মানুষ হয় বিশাল দৈত্য হয়ে যাচ্ছে, কিংবা হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদে লিলিপুট। দৈত্যাকার কীট-পতঙ্গ নিয়েও কম কাহিনী লেখা হয়নি। তাতে দেখা যায়, এইসব দানব-পোকা প্রকাণ্ড মাপের লাফ দিতে পারে, নিজের ওজনের বহুগুণ ওজন বইতে পারে। যদি এ ধরণের কোন পোকার মাপ মানুষের মতো হয়, তাহলে সে হয়তো দু-টন ওজন পিঠে বয়ে অনায়াসে দু-লাফে এক মাইল দূরত্ব পেরিয়ে যাবে।

আমাদের পৃথিবীর বুকে বহুকাল আগে যে সব প্রাগৈতিহাসিক দানব দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করতো, তাদের রাজা ছিলো টিরানোসরাস রেক্স। হয়তো আমাদের কল্পকাহিনীর দানব-পোকা শক্তি ও ক্ষমতায় সেই টিরানোসরাস-এর চেয়ে কিছু কম যায় না। কারণ কল্প-কাহিনীকাররা ধরেই নেন, শরীরের ওজন যতো গুণ বাড়বে, পোকাটির শক্তি ও ক্ষমতা একই হারে তরতর করে বেড়ে যাবে। অথচ সত্যি-সত্যি সেটা কখনই হওয়া উচিত নয়। কারণ বিজ্ঞানে 'স্কোয়ার-কিউব ল,' বা 'বর্গ-ঘন সূত্র' বলে একটা নিয়ম আছে যেটা এইরকম সব দানব-পোকা বা দৈত্য-মানুষকে রীতিমতো অসুবিধেয় ফেলে দেবে। কিভাবে, সেটা এবারে একটু খতিয়ে দেখা যাক।



তোমরা নিশ্চয়ই জানো কোন কিউবের বা ঘনকের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এক সেন্টিমিটার হয় তাহলে তার আয়তন হবে, ১×১×১=১ ঘন সেঃ মিঃ। প্রতিটি বাহু দু' সেন্টিমিটার হলে, তার আয়তন হবে,

২×২×২=৮ ঘন সেঃ মিঃ। ৩ সেঃ মিঃ বাহু হলে, ঘনকের আয়তন হবে ২৭ ঘন সেঃ মিঃ।

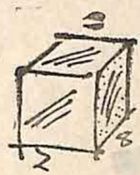
আয়তনের হিসেব ছেড়ে এবার ক্ষেত্রফলের দিকে যাওয়া যাক।

একটা ঘনকের মোট ছ'টা পিঠ থাকে—ঠিক লুডো খেলার ছক্কা ঘুঁটির মতো। আর সেই প্রত্যেকটা পিঠ এক একটা বর্গক্ষেত্র—অর্থাৎ, তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। অতএব, যদি কোন ঘনকের প্রতিটি বাহু ১ সেঃ মিঃ হয়, তাহলে তার একটা পিঠের ক্ষেত্রফল, ১×১=১ বর্গ সেঃ মিঃ। সুতরাং ঘনকের মোট ক্ষেত্রফল হবে তার ছ'টা পিঠের ক্ষেত্রফলের যোগফল=১+১+১+১+১+১=৬ বর্গ সেঃ মিঃ।

এইভাবে হিসেব করলে ২ সেঃ মিঃ বাহু=বিশিষ্ট ঘনকের এক এক পিঠের ক্ষেত্রফল, ২×২=৪ বর্গ সেঃ মিঃ, এবং তার মোট ক্ষেত্রফল=৪×৬=২৪ বর্গ সেঃ মিঃ।

সুতরাং বাহুর দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কোন ঘনকের মোট ক্ষেত্রফল ও আয়তন কিভাবে বাড়ে তার আন্দাজ পাওয়ার জন্য একটা তালিকা দেওয়া হলো। লেখার সুবিধের জন্য সেঃ মিঃ, বর্গ সেঃ মিঃ ও ঘন সেঃ মিঃ, এই কথাগুলোর উল্লেখ করা হয়নি।

বাহুর দৈর্ঘ্য	মোট ক্ষেত্রফল	আয়তন
১	৬	১
২	২৪	৮
৩	৫৪	২৭
৬	২১৬	২১৬
১০	৬০০	১০০০
২৫	৩৭৫০	১৫৬২৫
৫০	১৫০০০	১২৫০০০
১০০	৬০০০০	১০০০০০০





ফর্দটা দেখেই আশা করি বুঝতে পারছো, বাহুর দৈর্ঘ্য ৬ সেঃ মিঃ পেরোনোর পর থেকেই ক্ষেত্রফলকে পিছনে ফেলে আয়তন কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে! আর আয়তন বেড়ে ওঠা মানেই ঘনকের ওজনও বাড়ছে।

শুধু ঘনক কেন, যে কোন সুষম আকারের বস্তু নিয়ে এই হিসেব কষলেই দেখা যাবে, মাপ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর বাইরের তলগুলোর ক্ষেত্রফল যেভাবে বাড়তে থাকে, আয়তন বেড়ে চলে তার চেয়ে অনেক অনেক তাড়াতাড়ি।



কোন থাপছাড়া মাপের বস্তুর বেলায়ও যদি ঠিক ঠিক অনুপাতে তার মাপ বাড়ানো হয়, তাহলে এই একই ঘটনা ঘটবে।

এবারে আসা যাক আরো গুরুতর অংশে।

মনে করো, একটা টেবিলের ওপরে একটা ঘনক রয়েছে। ঘনকের প্রতিটির বাহুর মাপ ১০ সেঃ মিঃ ও তার ওজন এক কিলোগ্রাম বা ১০০০ গ্রাম। তাহলে আমাদের ফর্দ থেকে দেখা যাচ্ছে ঘনকের আয়তন ১০০০ ঘন সেঃ মিঃ। অর্থাৎ, তার প্রতি ঘন সেঃ মিঃ আয়তনের ওজন এক গ্রাম। সোজা কথায়, এটাই হলো ঘনকের ঘনত্ব। ঘনকের যে পিঠটা টেবিল স্পর্শ করে বসে রয়েছে, তার ক্ষেত্রফল, ১০ × ১০ = ১০০ বর্গ সেঃ মিঃ। এই ১০০ বর্গ সেঃ মিঃ জায়গাকেই কিন্তু সইতে হচ্ছে ঘনকের ১০০০ গ্রাম ওজন। অন্যান্য পাঁচটা পিঠ ওজন বইবার ব্যাপারে কোন কাজেই আসছে না। ফলে, প্রতি বর্গ সেঃ মিঃ ক্ষেত্রফলে চাপ পড়ছে, $\frac{১০০০}{১০০}$ = ১০ গ্রাম করে।



এইবারে ধরা যাক, ঘনকের বাহুর মাপ দেওয়া হলো বাড়িয়ে। অর্থাৎ, যা আগে ছিলো ১০ সেঃ মিঃ, এখন সেটা হয়ে গেলো ১০০ সেঃ মিঃ। সুতরাং ফর্দ থেকে দেখতে পাচ্ছো, এখন ঘনকের আয়তন ১০০০,০০০ ঘন সেঃ মিঃ। যে জিনিস দিয়ে ঘনকটা তৈরী, তার ঘনত্ব যদি একই থাকে,

তাহলে ঘনকের নতুন ওজন হবে ১০০০,০০০ গ্রাম বা হাজার কিলোগ্রাম। এই হাজার কেজি ওজনের ঘনকটা এখন টেবিলে রাখলে কি হবে দেখা যাক।

নতুন ঘনকের এক পিঠের ক্ষেত্রফল ১০০০০ বর্গ সেঃ মিঃ। আর প্রথম বারের মতো এবারেও তার মাত্র একটা পিঠ স্পর্শ করবে টেবিলের কাঠ। ফলে ঐ ১০০০০ বর্গ সেঃ মিঃ জায়গাকেই সইতে হবে ঘনকের এক হাজার কিলোগ্রাম ওজন। সুতরাং, প্রতি বর্গ সেঃ মিঃ ক্ষেত্রফলে কতোটা করে চাপ পড়ছে সেটা আগের মতো হিসেব করলে উত্তর হবে, $\frac{১০০০০০০}{১০০০০}$ = ১০০ গ্রাম।

অর্থাৎ, প্রথম বারে যে চাপ ছিলো ১০ গ্রাম, বাহুর মাপ দশগুণ করে বাড়ানোর ফলে সেই চাপ হয়ে গেছে দশগুণ বেশি, বা ১০০ গ্রাম।

এ থেকেই একটা সহজ হিসেব আমরা পেয়ে যাচ্ছি। সেটা হলো, ঘনকের প্রতি বাহুর মাপ যতো গুন করে বাড়ানো হবে, প্রতি একক ক্ষেত্রফলে তার ওজনের চাপও ঠিক ততো গুন বেড়ে যাবে।

এইভাবে যদি একটা কিউবকে ক্রমাগত মাপে বাড়ানো হয়, তাহলে তার ওজন ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। শেষে এমন একটা অবস্থা আসবে, যখন নিজের ওজনের ভারে ঘনকটা ধীরে ধীরে চ্যাপ্টা হতে শুরু করবে।

এতোক্ষণ আমরা ঘনক নিয়ে নানান হিসেব করেছি। তবে এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো, শুধু ঘনক কেন, যে কোন ত্রিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রেই মোটামুটি ভাবে এই একই ঘটনা ঘটবে। এমনকি মানুষও এই পরিণতি থেকে রেহাই পাবে না।



আমরা যখন দাঁড়িয়ে থাকি, তখন আমাদের শরীরের সমস্ত ওজন সইতে হয় দুটো পায়ের পাতাকে। মনে করা যাক, কোন মানুষের ওজন ৮০ কিলোগ্রাম, এবং তার দুটো

পায়ের পাতার মোট ক্ষেত্রফল ৩০০ বর্গ সেন্টিমিটার। তাহলে প্রতি বর্গ সেঃ মিঃ জায়গাকে যে ওজন বইতে হচ্ছে সেটা হলো, ২৬৮ গ্রাম।

এবারে গালিভারের গল্পের সেই দানবের মতো যদি এই মানুষটিকে আমরা সব দিকেই ১২ গুণ করে বাড়িয়ে দিই, আর তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপগুলো ঠিক একই অনুপাতে বজায় রাখি, তাহলে যেখানে তার উচ্চতা ছিলো হয়তো ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, সেটা এখন দাঁড়াবে প্রায় ৭০ ফুট। একেবারে সাত তলা বাড়ির সমান!

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, তিন দিকের মাপই বারো গুণ করে বেড়ে গেলে এই দানব-মানুষের ওজন হবে, ৮০ × ১২ × ১২ × ১২ কিলোগ্রাম। অর্থাৎ, প্রায় ১৪০ মেট্রিক টন—সবচেয়ে বড় যে তিমির সন্ধান পাওয়া গেছে, প্রায় তার ওজনের কাছাকাছি! এখন মানুষটির পায়ের পাতার মোট ক্ষেত্রফল দাঁড়াবে ৩০০ × ১২ × ১২ = ৪৩২০০ বর্গ সেঃ মিঃ, এবং প্রতি বর্গ সেঃ মিঃ ক্ষেত্রফলে চাপ পড়বে তিন কিলোগ্রামেরও কিছু বেশি, অর্থাৎ ২৬৬ গ্রামের ১২ গুণ!

শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটবে। উরুর হাড় বা উর্বাস্থি আগে একক ক্ষেত্রফলে যে ওজন বইতো, এখন তাকে বইতে হবে ১২ গুণ বেশি। বসে থাকা অবস্থা থেকে যদি আমাদের দৈত্য-মানব উঠে দাঁড়াতে চায়, তাহলে তার পেশীর টানও হয়ে যাবে আগের তুলনায় ১২ গুণ।



এই দৈত্যের অবস্থাটা কি হবে সেটা বুঝতে গেলে তোমার পায়ের পাতার প্রতি বর্গ সেঃ মিঃ ক্ষেত্রফলে তিন কিলোগ্রাম করে ওজন চাপাতে হবে। এর ফলে তোমার দেহের মোট ওজন হতে হবে ন'শো কিলোগ্রাম। ফলে নিজের ওজনের ভারে তুমি নিজেই পড়ে যাবে মেঝেতে, এবং বলাই বাহুল্য, বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

তাহলে এই সব দৈত্যদের ত্ব'পায়ে খাড়া রাখতে গেলে কি করতে হবে ? হয় তাদের হাড়গুলো আরও মজবুত জাতের কোন জিনিস দিয়ে তৈরী করতে হবে, নয়তো হাড়গুলোকে করতে হবে বেঢপ মোটা।

শুনলে অবাক হবে, এই তথ্যটি প্রথম আবিষ্কার করেন বিখ্যাত ইটালিয়ান বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। কোন মানুষকে তিনগুণ বড় করলে তার ওজন ঠিকমতো বইবার জন্য তার উরুর হাড়, অর্থাৎ উর্বাস্থি, লম্বায় তিনগুণ বড় করেও কি পরিমাণে বেঢপ মোটা করা দরকার, সেটা একটা সুন্দর ছবি এঁকে দেখিয়েছিলেন গ্যালিলিও। তিনি বলেছিলেন. কোন মানুষকে আকারে ছোট করে দিলে তার তুলনামূলক শক্তি বেড়ে যাবে। একটা সাদামাটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টায় গ্যালিলিও বলেছিলেন, 'একটা ছোট্ট কুকুর হয়তো নিজের মাপের ত্ব'তিনটে কুকুরকে পিঠে তুলে নিতে পারবে, কিন্তু একটা ঘোড়া নিজের মাপের একটা ঘোড়াকেও তুলতে পারবে না।'

এই জিনিসটা তোমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে, যদি তোমরা ইঁত্বর, কুকুর ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি প্রাণীর পায়ের গঠনগুলো ভালো করে লক্ষ্য করো। লক্ষ্য করলেই দেখবে, শরীরের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে যতোটা মোটা হওয়া দরকার, পা-গুলো তার চেয়ে কিছু বেশি মোটা। যদি প্রত্যেকটা প্রাণীকে এমন ভাবে আঁকা যায় যাতে তাদের উচ্চতা সমান থাকে, তাহলে এই ব্যাপারটা তোমাদের চোখে সরাসরি ধরা পড়বে।

সুতরাং, মানুষের মাপের পোকা নিজের জায়গা ছেড়ে নড়তেই পারবে না, কারণ তার পা-গুলো একেবারে অকেজো হয়ে পড়বে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে শুধু নড়াচড়া কেন, লাফানো, ওড়া, সবকিছু তার বন্ধ হয়ে যাবে চিরকালের জন্য।



দৈত্য-মানুষের বুদ্ধি

মানুষ হঠাৎ করে দৈত্য হয়ে গেলে তার যে শুধু ওঠা-বসা চলাফেরায় অসুবিধে হবে তাই নয়, অন্যান্য কতকগুলো সমস্যাও দেখা দেবে।

যেমন, তার শরীরের ভিতরে যে তাপ তৈরি হয়, সেটা নির্ভর করে তার আয়তনের ওপর। আর যে তাপ সে ছেড়ে দেয়, সেটা মোটামুটি ভাবে নির্ভর করে তার শরীরের খোলা অংশের ক্ষেত্রফলের ওপর। সুতরাং, যতো সে আয়তনে বাড়বে, ততোই বেড়ে যাবে তার তাপ তৈরীর হার। অথচ তাপ ছেড়ে দেওয়ার হার সেই অনুপাতে বাড়বে না। ফলে দৈত্য-মানুষ হয়তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে নিজের উত্তাপে।

তোমরা তো আগেই দেখেছো, ছোট ছোট প্রাণীর তাপ তৈরীর হার বড় প্রাণীদের তুলনায় অনেক বেশি। দ্রুত হারে তাপ তৈরী করার জন্য তাদের খেতে হয় খুব ঘন ঘন। সেই খাদ্য থেকেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি হয় তাপ। এই কারণেই একটা হামিং বার্ড যদি কয়েক ঘণ্টা না খেয়ে থাকে তাহলে বেচারী খিদের চোটে মারাই যাবে। অথচ একটা হাতী না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে অনেক বেশি সময়।



এছাড়া রয়েছে অক্সিজেন গ্রহণের সমস্যা।

একটা প্রাণীর কতোটা অক্সিজেন প্রয়োজন সেটা নির্ভর করে তার শরীরের আয়তনের ওপর। কিন্তু যে হারে সে অক্সিজেন গ্রহণ করে সেটা নির্ভর করে তার ফুসফুসের ভেতরকার ক্ষেত্রফলের ওপর। যেসব প্রণীর রক্ত গরম, তাদের অক্সিজেন দরকার হয় বেশি। যাদের রক্ত ঠাণ্ডা,

তাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন অনেক কম। আমাদের ফুসফুসে মোট ষাট কোটি ছোট ছোট থলি রয়েছে, এবং তাদের তলের মোট ক্ষেত্রফল প্রায় ৫৭ বর্গ মিটার। যদি এই ক্ষেত্রফল অস্বাভাবিক ভাবে কমে যায়, তাহলে আমরা দম বন্ধ হয়েই মারা যাবো।

এরপর আসছে রক্ত ছেঁকে পরিষ্কার করা, বা পরিস্রাবণের সমস্যা।

আমাদের শরীরে রক্তের পরিমাণ নির্ভর করে আমাদের দেহের ওজন বা আয়তনের ওপর। কিন্তু এই রক্ত নিয়ত ফিলটার বা পরিস্রুত করে যে প্রত্যঙ্গ, সে হলো কিডনি। যে হারে রক্ত পরিস্রুত হয় সেটা নির্ভর করে কিডনির ক্ষেত্রফলের ওপর। সুতরাং, আবার আমরা মুখোমুখি হচ্ছি সেই পুরনো আয়তন ও ক্ষেত্রফলের সমস্যার। সোজা কথায় 'বর্গ-ঘন সূত্র' এসে মানুষের দৈত্য হবার পথে চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এবারে আসা যাক মানুষের সবচেয়ে দামী প্রত্যঙ্গের আলোচনায়। সাত রাজার ধন এক মাণিক আমাদের মস্তিষ্ক বা ব্রেন। মানুষ যদি দৈত্য হতে চায়, তাহলে তার বুদ্ধির কি অবস্থা হবে সেটাই এবার পরখ করে দেখা যাক।

মানুষের মস্তিষ্কের ওজন মোটামুটি ১৪০০ গ্রামের মতো, এবং আকারেও বেশ বড়। অবশ্য মানুষের চেয়ে বড় মস্তিষ্কও আছে। যেমন, একটা বড়-সড় হাতীর মস্তিষ্কের ওজন প্রায় ছ' কিলোগ্রামের কাছাকাছি, এবং একটা বড় তিমির মস্তিষ্কের ওজন সাড়ে আট কেজির বেশিও হতে পারে।

মস্তিষ্কের ওজন বেশি হলেই যে প্রাণীর বুদ্ধি বেশি হবে তা নয়। বুদ্ধিটা নির্ভর করে কতো ওজনের মস্তিষ্ক কতো ওজনের শরীরকে চালাচ্ছে, তার ওপর। অর্থাৎ,

$$\frac{\text{শরীরের ওজন}}{\text{মস্তিষ্কের ওজন}},$$

এই অনুপাতই বুদ্ধির মাপের ইঙ্গিত দেয়। এই অনুপাত



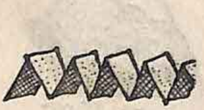
যে প্রাণীর সবচেয়ে কম, তার বুদ্ধি সবার চেয়ে বেশি। অর্থাৎ, মানুষই হলো সবার সেরা সেই বুদ্ধিমান প্রাণী, কারণ তার ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৫০। একটা বিশাল হাতীর ক্ষেত্রে এই অনুপাত ১০০০, রাক্ষুসে তিমির বেলায় ১০০০০, এবং প্রাগৈতিহাসিক দানব ডাইনোসরের অনুপাত ছিলো ১০০,০০০ বা এক লক্ষ !

একটা জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, কোন মানুষকে আকারে যতোই বড় করে দেওয়া হোক না কেন, তার শরীর ও মস্তিষ্কের ওজন একই হারে বাড়বে। ফলে শরীরের ওজন ও মস্তিষ্কের ওজনের অনুপাত সেই পঞ্চাশ-ই থেকে যাবে। এর থেকে মনে হওয়াটা খুব স্বাভাবিক যে মানুষ দৈত্য হয়ে গেলে তার বুদ্ধির কোন হের-ফের হবে না। কিন্তু আসলে তা মোটেও ঠিক নয়।

মস্তিষ্কের আসল যে কোষগুলো বুদ্ধি তৈরীর জন্য দায়ী, অর্থাৎ 'ধূসর কোষ', সেগুলো ছড়িয়ে থাকে মস্তিষ্কের তলের ওপর। ফলে দেখা যাচ্ছে, চিন্তা-ভাবনা-বুদ্ধি ইত্যাদির ক্ষমতা নির্ভর করে মস্তিষ্কের ওজনের ওপর নয়, বরং তার বাইরের তলের ক্ষেত্রফলের ওপর।

প্রাণীর আকার যতো বড় হবে, তার বুদ্ধি ঠিক রাখতে গেলে 'বর্গ-ঘন সূত্র'-এর চেয়েও দ্রুত হারে তার মস্তিষ্ক-তলের ক্ষেত্রফল বাড়ানো দরকার। এই ক্ষেত্রফল বাড়াতে গেলেই মস্তিষ্কে আঁকাবাঁকা বহু ভাঁজের দরকার হয়ে পড়ে। ধূসর কোষগুলো এই আঁকাবাঁকা ঢেউ-খেলানো তল ধরে বসে থাকে বলেই তারা সংখ্যায় অনেক বেশি হয়। যদি তলটা ঢেউ-খেলানো না হয়ে টানটান হতো, তাহলে ধূসর কোষের সংখ্যা অনেক কমে যেতো।

এইসব কারণেই, কোন্ প্রাণীর মস্তিষ্ক কতোটা আঁকাবাঁকা ঢেউ-খেলানো সেটা দেখেই তার বুদ্ধির একটা আঁচ পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে মানুষের মস্তিষ্কের ভাঁজ সমস্ত প্রাণীর চেয়ে অনেক অনেক বেশি।



কোন মানুষকে যদি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, সবদিকেই ১২ গুণ করে মাপে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কও যে সবদিকে ১২ গুণ মাপে বেড়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মস্তিষ্কের ওজন ঠিক অনুপাতে বাড়লেও তার উপরিতলের ক্ষেত্রফল 'বর্গ-ঘন সূত্র' অনুযায়ী পিছিয়ে পড়বে। সুতরাং মস্তিষ্কের আঁকাবাঁকা ভাঁজের সংখ্যা যদি ১২ গুণ না বাড়ে, তাহলে ধূসর কোষের সংখ্যাও কমে যাবে, এবং এই মস্তিষ্ক নতুন দৈত্য-মানুষের দেহকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। যদি কোন দৈত্য-মানুষের মস্তিষ্ক ভাঁজে না বেড়ে শুধুই ওজনে ও আয়তনে বেড়ে যায়, তাহলে সেই প্রকাণ্ড মস্তিষ্কের ওজন প্রায় আড়াই টন হলেও দৈত্য-মানুষটির বুদ্ধি হবে একেবারে নিরেট মূর্খের মতো!

সুতরাং, এখন নিশ্চয়ই বুঝেছো, মানুষকে হঠাৎ করে মাপে বাড়িয়ে দৈত্য করে দিলে সেই দৈত্য-মানুষ বেচারা আমাদের তেমন কোন কাজেই আসবে না!



মাছি ! মাছি !

'মুস্কা ডোমেস্টিকা' বললে তোমরা অনেকে হয়তো কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না ; কিন্তু যদি বলি, জিনিসটা নিত্যদিন তোমরা শ'য়ে শ'য়ে দেখে থাকো, তাহলে ? যাকে নিয়ে কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন 'রেতে মশা দিনে মাছি, দুই নিয়ে কলকেতায় আছি।' সেই মাছিমশাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়, যার ভালো নাম 'মুস্কা ডোমেস্টিকা', আর ডাক নাম 'মাছি'।

এইবার যে খবরটা দেবো, সেটা শুনে কিন্তু একটুও অবাক হয়ো না বা চমকে উঠো না। খবরটা হলো, আমাদের এই পৃথিবীতে মোট পঁচাশি হাজার রকম মাছি আছে! অবশ্য এই হিসেবের মধ্যে মশার প্রজাতিকেও ধরে নেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, পৃথিবীতে প্রথম ডানাওয়ালা পোকামাকড়ের সৃষ্টি হয় আজ থেকে প্রায় তিরিশ কোটি বছর আগে। তখন তাদের ডানাগুলো ছিলো শক্ত, এরোপ্লেনের পাখার মতো। মোটেই নড়ানো যেতো না ওপর-নিচে। শুধু হাওয়ায় ভর করে এখান থেকে ওখানে লাফিয়ে ভেসে যেত পোকামাকড়রা। তারপর লক্ষ কোটি বছর ধরে বিবর্তনের পর আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তাদের ডানার চেহারা।

অন্যান্য ডানাওয়ালা পোকামাকড়ের সঙ্গে মাছির একটা ছোট্ট তফাৎ আছে। অন্যান্যদের মতো মাছির দু-জোড়া ডানা নেই। তার ডানা মাত্র একজোড়া। এটুকু তফাৎ ছাড়া অন্যান্য পোকামাকড়দের মতো মাছিও ছোট থেকে বড় হয় অনেক কষ্টে—ধাপে ধাপে। স্ত্রী মাছি ডিম

পাড়ে খাবার-দাবারের খুব কাছাকাছি, যাতে ডিম ফুটে বেরিয়ে শূক কীটগুলো ঠিক মতো খেতে পায়। চামড়া যতোদিন নরম থাকে ততোদিন শূক কীটগুলো আকারে বড় হয়। তারপর চামড়া শক্ত হয়ে গেলে যখন আর বাড়তে পারে না, তখন খোলস ছাড়ে। ব্যস, নতুন চামড়া পেয়েই আবার সে বড় হতে থাকে। এই রকম বার কয়েক খোলস ছেড়ে অবশেষে শূক কীট পরিণত হয় মাছিতে।

মাছি যে বেশ তাড়াতড়ি ওড়ে সে তো তোমরা নিজের চোখেই দেখেছো। কিন্তু সেকেণ্ডে কতো বার সে ডানা নাড়ে, কতো গতিবেগ নিয়ে উড়ে যায় তা কি জানো ?

যে মাছি আমরা সব সময় দেখি সেগুলো ডানা নাড়ে সেকেণ্ডে মোটামুটি ২০০ বার। এটা কি করে মাপা হয় সেটাও জেনে নাও।

কোন মাছিকে খুব হালকা কোন সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় অনুভূমিক ভাবে শোয়ানো একটা বড় পাইপের মুখে। তারপর পাইপ দিয়ে পাম্প করে হাওয়া পাঠানো হয় মাছিটাকে লক্ষ্য করে। মাছিটা তখন হাওয়ার ঠেলায় পেছনে সরে যেতে থাকে। কিন্তু সেটা সে বরদাস্ত করবে কেন ? সুতরাং নিজের জায়গা বজায় রাখার জন্য মাছিটা ডানা নেড়ে সামনে এগোতে চায়। হাওয়ার গতি বাড়িয়ে কমিয়ে মাছির ওড়ার গতিবেগের সঙ্গে সমান করে দিলেই মাছিটা শূন্যে একই জায়গায় স্থির হয়ে বিরাট উৎসাহে ডানা নাড়তে থাকে। সে তো আর বুঝতে পারছে না, এভাবে তাকে ঠকানো হচ্ছে! সে ভাবে, সে বুঝি দিব্যি উড়ে সামনে এগিয়ে চলেছে।



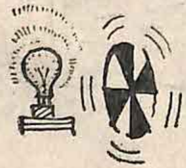
এরপর পাইপ দিয়ে যে হাওয়া পাঠানো হয়, তার গতিবেগ মেপে ফেললেই মোটামুটি ভাবে মাছির গতিবেগ পাওয়া যাবে। পরীক্ষায় সাধারণতঃ দেখা গেছে, মাছির ওড়ার গতিবেগ ঘণ্টায় মাত্র ছ' কিলোমিটার! কোন কোন ক্ষেত্রে,

বিশেষ করে অল্প দূরত্ব অতিক্রম করার সময়, এই গতিবেগ বেড়ে ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়।

এবার দেখা যাক একটা মাছি এক সেকেণ্ডে কতোবার ডানা নাড়ে।

স্ট্রবোস্কোপ নামে একরকম যন্ত্র আছে। এই যন্ত্র থেকে আলো বেরোয়, তবে সাধারণ আলোর মতো নিশ্চয়ই নয়। স্ট্রবোস্কোপের আলো জ্বলে-নেভে, ঝিলিক মারে। তাছাড়া এই জ্বালা-নেভার হার ইচ্ছে মতো কমানো-বাড়ানো যায় : যেমন, এক সেকেণ্ড পঞ্চাশ, একশো, কি দু'শো বার হয়তো আলোটা জ্বলছে নিভছে। জ্বলা-নেভার হার বেশি হলে আমাদের চোখে সেটা ধরা পড়ে না—মনে হয়, আলোটা স্থিরভাবেই জ্বলে আছে।

একটা স্ট্রবোস্কোপ কিভাবে বানিয়ে ফেলা যায় খুব সাদামাটা ভাবে সেটা এবার জেনে নাও। প্রথমে দরকার একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব। আর দরকার একটি গোল চাকতি। ধরো, চাকতিটা সমান আটটি অংশে ভাগ করা। সেই আট ভাগের চার ভাগ বন্ধ, আর বাকি চার ভাগ খোলা। এবারে জ্বলন্ত বাল্বের সামনে যদি চাকতিটা ঘোরাবার ব্যবস্থা করো, তাহলে চাকতির এপাশ থেকে তুমি আলো একবার দেখতে পাবে, একবার পাবে না। অর্থাৎ, চাকতির কালো, অথবা বন্ধ অংশ বাল্বের সামনে এলেই আলো হয়ে যাবে অন্ধকার। এই অন্ধকার খুব ভালো ভাবে পেতে হলে বাল্বের সামনে একটা কালো রঙের বড় পিচবোর্ড রেখে তার গায়ে বাল্ব বরাবর একটা ফুটো করে নিতে হবে। তাহলেই তুমি পেয়ে যাবে একটি সরু পেন্সিল-রশ্মি। এই পেন্সিল-রশ্মির সামনে চাকতিটা ঘোরাতে পারলে খুব ভালো হয়। অবশ্য চাকতি ঘোরানোর জন্য তোমাকে ছোট বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্য নিতে হতে পারে। দেখবে, চাকতির পাক খাওয়ার বেগের সঙ্গে তাল রেখে বাড়বে-কমবে আলোর



ঝিলিক। সোজা কথায়, চাকতির ঘূর্ণনের বেগ কম-বেশি করে তুমি স্ট্রবোস্কোপের ঝিলিকের কম্পাঙ্ক ইচ্ছে মতো কম-বেশি করতে পারো।

এখন, সেকেণ্ডে কতোবার মাছিটা ডানা নাড়ছে সেটা বুঝতে গেলে পাইপের মুখে স্থিরভাবে উড়ন্ত মাছির ওপর স্ট্রবোস্কোপের আলোর ঝিলিক ফেলতে হবে। এক সেকেণ্ডে যতোবার আলোটা ঝিলিক মারে, সেই সংখ্যাকে বলা হয় স্ট্রবোস্কোপের আলোর কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সী। এই ঝিলিকের কম্পাঙ্ক যদি মাছির ডানা নাড়ানোর হার বা কম্পাঙ্কের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মাছিটাকে দেখলে মনে হবে সে আর ডানা নাড়ছে না। ডানাজোড়া এরোপ্লেনের ডানার মতো অচল-অনড় করে রেখেছে। এটা কিন্তু বলতে গেলে আলোর ধাঁধা। ধরো, প্রথম যখন স্ট্রবোস্কোপের আলো মাছিটার ডানায় পড়লো তখন তার ডানা একটা বিশেষ জায়গায় রয়েছে। তারপর আলো নিভে অন্ধকার হয়ে যেতেই ডানাজোড়া আর দেখা যাবে না। যদিও মাছি-মহাশয় কিন্তু ডানা নেড়েই চলেছেন !

আবার যখন স্ট্রবোস্কোপের আলো জ্বলবে, তখন ডানা-জোড়া আবার ফিরে এসেছে আগের জায়গায়। কারণ, ডানা নাড়ানোর কম্পাঙ্ক ও স্ট্রবোস্কোপের আলোর ঝিলিকের কম্পাঙ্ক সমান হয়ে গেছে বলে আমরা আগেই ধরে নিয়েছি। সুতরাং, এইভাবে যতোবারই স্ট্রবোস্কোপের আলো জ্বলবে, ততোবারই ডানাজোড়াকে ঐ একই অবস্থানে দেখা যাবে। কারণ, স্ট্রবোস্কোপের আলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডানাজোড়া বার বার একই জায়গায় ফিরে এসে দেখা দিচ্ছে।



লিখতে এতোটা সময় লাগলেও ঘটনাটা আসলে ঘটছে খুব দ্রুত—ধরো, এক সেকেণ্ডে দু'শো বার। ফলে,

অনুবীক্ষণে তাকিয়ে তোমাদের মনে হবে, মাছিটা যেন ডানাজোড়াকে একই জায়গায় স্থির রেখে দিয়েছে।

দুটো কম্পাঙ্ক সমান হলেই মাছির ডানাজোড়া স্থির মনে হয়। কিন্তু যদি সমান না হয়ে কম্পাঙ্কের মধ্যে সামান্য তফাৎ থাকে, তাহলে মনে হবে মাছিটা খুবই আস্তে আস্তে ডানা নাড়ছে। ধরা যাক, স্ট্রবোস্কোপের আলো এক সেকেণ্ডে জ্বলছে-নিভছে ১৯৮ বার, আর মাছিটা ডানা নেড়ে চলেছে এক সেকেণ্ডে ২০০ বার। তাহলে দেখে তোমাদের মনে হবে, মাছিটা সেকেণ্ডে মাত্র দু'বার করে ডানা নাড়ছে—যেহেতু দুটো কম্পাঙ্কের তফাৎ হচ্ছে 'দুই'!



সুতরাং তোমাদের যদি কারো ধারণা থেকে থাকে, মাছি খুব তাড়াতাড়ি ওড়ে বা সেকেণ্ডে দু-তিন হাজার বার ডানা নাড়ে, তাহলে সেই ধারণা এবার থেকে শুধরে নিতে পারো। আর মাছি ও মানুষে যদি গতিবেগের প্রতিযোগিতা হয় তাহলে একটু জোরে হাঁটলেই মাছি হেরে যাবে মানুষের কাছে—তা সে যতো জোরেই ওড়ার চেষ্টা করুক না কেন! অতএব দেখা যাচ্ছে, মাছিকে মিছিমিছি বেশি গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়।

আবিষ্কারের রাজা

রাজা না বলে খুব সহজেই সম্রাট বলা যায় এই বিজ্ঞানীকে। কারণ সারাজীবনে তিনি মোট ১৩০০ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিলো প্রতি দশদিন অন্তর একটা করে নতুন নতুন আবিষ্কার করা। আর অবাক কাণ্ড! সত্যিই নিজের ইচ্ছে তিনি পূরণ করতে পেরেছিলেন। একসময় তো মাত্র চার বছরে এই বিজ্ঞানী তিনশোটা আবিষ্কার করেছিলেন। হিসেব করলেই দেখতে পাবে, প্রতি পাঁচদিন অন্তর একটা করে আবিষ্কার!

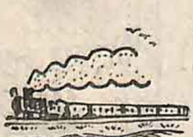
অথচ ভাবলে আশ্চর্য লাগে, এই আবিষ্কারের সম্রাট পড়াশোনার তেমন সুযোগ পাননি। সেই ছোটবেলা থেকেই তিনি সবাইকে নানানরকম অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করতেন। এইসব প্রশ্নের বহর দেখে হতবাক পাড়াপড়শিরা ভাবতেন, ছেলেটির মাথায় বোধহয় ছিট আছে। আর, ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা তো ছেলেটির মাকে বললেন, ওর দ্বারা পড়াশোনা হবে না। কারণ, সোজা কথায় ছেলেটি নাকি 'মাথা মোটা'। সুতরাং ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলো। ছেলেটির মা ইস্কুলে পড়ানোর চাকরি করতেন। ফলে ঘরে বসিয়েই তিনি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন।

এরপর ছেলেটির মধ্যে পরিবর্তন স্পষ্ট হতে লাগলো। যতো দিন যায়, তার স্মরণ শক্তি যেন ততোই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া, সে পড়েও যেন বিদ্যুৎগতিতে। ঝটপট উল্টে যায় বইয়ের পাতা, আর সেই সঙ্গে আত্মসাৎ করে ফেলে বইয়ের বিষয়বস্তু। একমাত্র আইজাক নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' বইটা তার কাছে একটু কঠিন লেগেছিলো—অবশ্য তখন ছেলেটির বয়েস মাত্র বারো বছর!



বিজ্ঞানের বইপত্র পড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়িতে একটা ল্যাবরেটরী তৈরি করে ফেললো। সেখানে বিচিত্র সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে মেতে থাকতো দিনরাত। এর মধ্যে সে একটা চাকরিও পেলো। ট্রেনে খবরের কাগজ বিক্রি করার কাজ। সেই কাজের ফাঁকে সময় পেলেই সে স্টেশনের লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা করতো। কিন্তু কাগজ বিক্রি করে তার মন ভরে না। কোনরকমে টাকাপয়সা জমিয়ে একটা পুরোনো ছাপার মেশিন কিনে ফেললো সে। তারপর ট্রেনে বসেই ছাপতে শুরু করলো খবরের কাগজ—পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রথম ট্রেনে খবরের কাগজ ছাপা হয়। এরপর আর একটা অদ্ভুত কাজ করলো সে। নতুন করে জমানো টাকা দিয়ে ট্রেনের মালপত্র রাখার কামরায় একটা রসায়নাগার বানিয়ে ফেললো। কিন্তু একদিন আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় তার ল্যাবরেটরীতে আগুন লেগে যায়। তখন রেল কর্তৃপক্ষ ল্যাবরেটরী ও তার মালিক, দুজনকেই ট্রেন থেকে বিদেয় করে দেয়।

একদিন একটা মালগাড়িতে ওঠার চেষ্টা করলে গাড়ির কণ্ডাক্টর তাকে কান ধরে টেনে তোলে গাড়িতে। আর সেই থেকেই নাকি ছেলেটি কালা হয়ে যায়। তারপর, পনেরো বছর বয়েসে ঘটে গেলো আর এক বিচিত্র ঘটনা। একটি ছোট্ট ছেলে রেললাইন পার হচ্ছে। ওদিকে দৈত্যের মতো ছুটে আসছে দুরন্ত-গতি ট্রেন। ছেলেটির বাবা ঘটনাটা একেবারেই খেয়াল করেননি। যখন করলেন, তখন আর সময় নেই। কিন্তু হঠাৎই কোথা থেকে ছুটে এলো আমাদের কিশোর-প্রতিভা। একেবারে গ্রীক কিংবদন্তীর নায়কের মতো নিজের প্রাণ বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচালো হতভম্ব ছোট্ট ছেলেটিকে। ছেলেটির বাবা কৃতজ্ঞতায় ভবিষ্যতের এই বিজ্ঞানীকে বললেন, 'দেখো, আমার টাকাপয়সা কিছুই নেই যে তোমাকে পুরস্কার দেবো।

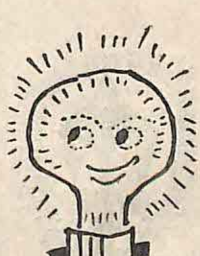


তুমি যদি রাজী হও, তাহলে তোমাকে আমি টেলিগ্রাফী শেখাতে পারি।' ব্যস, অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটি হয়ে উঠলো আমেরিকার সেরা ও সবচেয়ে দ্রুত টেলিগ্রাফার। তারপর পয়সা জমিয়ে সে কিনে ফেললো প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের লেখা সমস্ত বই। সেসব বই পড়ে তার ঝোক এলো বিদ্যুতের প্রযুক্তিবিদ্যার দিকে।

মাত্র একুশ বছর বয়েসে নিজের প্রথম আবিষ্কার পৃথিবী-বাসীকে উপহার দেন এই বিজ্ঞানী। আবিষ্কারটি হলো, ভোট দেবার পদ্ধতিকে যান্ত্রিক উপায়ে দ্রুতগতি করা।

১৮৬৯ সালে তিনি চাকরির খোঁজে নিউ ইয়র্কে এলেন। একটা অফিসে গিয়ে তিনি বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন ইণ্টারভিউ দেবার জন্য। এমন সময় অফিসের টেলিগ্রাফ মেশিনটি খারাপ হয়ে যায়। ইণ্টারভিউ দেবার জন্য যারা হাজির ছিলেন তার মধ্যে একমাত্র তিনিই জানতেন টেলিগ্রাফ মেশিনের যান্ত্রিক খুঁটিনাটি। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মেশিনটি তিনি সারিয়ে দিলেন। তখন কোম্পানীর মালিক ভীষণ খুশি হয়ে তাঁকে অনেক বেশী মাইনের একটা চাকরি দিয়ে ফেললেন।

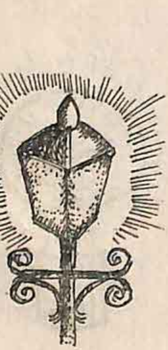
এরপর চললো তাঁর একটানা আবিষ্কারের পালা। এক একটা আবিষ্কার বেশ মোটা দামে বিক্রি হয়ে যাওয়ায় তাঁর আর্থিক সঙ্গতি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। অবশেষে ১৮৭৬ সালে, মাত্র উনত্রিশ বছর বয়েসে নিউ জার্সির মেন্‌লো পার্ক-এ তিনি তৈরি করলেন নিজের ল্যাবরেটরী—সোজা কথায় আবিষ্কারের কারখানা।



এতোক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছো এই বিজ্ঞানীর পরিচয়। যদি না পেরে থাকো, তাহলে তাঁর একটা বিশেষ আবিষ্কারের কথা বললেই তোমরা তাঁকে চিনে ফেলবে। সেটা হলো, বৈদ্যুতিক বাল্ব। যার আবিষ্কারক হলেন টমাস আলভা এডিসন।

এডিসনের বাল্ব আবিষ্কারের কাহিনী বেশ অদ্ভুত। এই আবিষ্কারের জন্য কতো পরিশ্রম ও অর্থ তাঁকে যে খরচ করতে হয়েছিলো তার কোন সঠিক হিসেব নেই। তখন শহরের সব রাস্তাঘাটে জ্বলতো গ্যাসের আলো। বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আলো পাওয়ার জন্য একমনে গবেষণা চালাচ্ছেন। এডিসন হঠাৎই ঘোষণা করলেন যে তিনি এবার এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবেন। ততোদিনে এডিসন একের পর এক আবিষ্কার করে দেশবাসীকে এমনই চমকে দিয়েছেন যে তখন তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস—এডিসন ইচ্ছে করলে সব পারেন। সুতরাং যেইমাত্র এডিসন নিজের ইচ্ছের কথা ঘোষণা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডনে মজুত করা জ্বালানী গ্যাসের দাম কমে যেতে শুরু করলো।

কোন ধাতুর তার দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালে তারটা গরম হয়ে ওঠে। ফলে তার থেকে আলো বেরোয়। বাড়িতে হিটার জ্বাললে হিটারের তারটা যে লালাভ হয়ে পড়ে সেটা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। কিন্তু তাতে তেমন আলো হয় না। এডিসন এমন একটা ধাতুর তার ব্যবহার করতে চাইলেন, যে তার গরম হলে প্রচুর আলো দেবে অথচ নিজে গরমে গলে যাবে না। সুতরাং শুরু হলো তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।



কোন বাল্ব যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সেটা ছুঁড়ে ভাঙলে বেশ জোরে একটা শব্দ হয়। এই শব্দের কারণটা কি জানো? এর কারণ হলো, বাল্বের ভেতরটা বায়ুশূন্য করা থাকে। ফলে, বাল্বটা ভাঙা মাত্রই আশপাশের বাতাস ছুটে যায় সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে। আর তার জন্যই শব্দটা বেশ জোরে শোনায়।

এখন প্রশ্ন হলো, বাল্বের ভেতরটা কেন বায়ুশূন্য করা থাকে? তোমরা হয়তো জানো, তাপ পরিবহনের জন্য

কোন মাধ্যম প্রয়োজন। যে কারণে কোন লোহার রডের এক-প্রান্ত গরম করলে অন্য প্রান্তও ধীরে ধীরে গরম হয়ে ওঠে। তেমনি, বাল্বের ভেতরে যদি বায়ু থাকে, তাহলে ফিলামেণ্টের তাপ বায়ুকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে পৌঁছে যাবে কাঁচের দেওয়ালে। তারপর সেখান থেকে কাঁচ ভেদ করে সোজা বাইরের আবহাওয়ায়। এইরকম তাপ পরিবহনের ফলে ফিলামেণ্টের উত্তাপ ক্রমশঃ কমতে থাকবে।

এছাড়াও দ্বিতীয় একটা কারণ রয়েছে। সেটা হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া। বাল্বের ভেতরে বায়ু থাকলে তাতে থাকবে অক্সিজেন। ফিলামেণ্টের উত্তপ্ত ধাতু রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে পারে অক্সিজেনের সঙ্গে। ফলে আলো দেবার মতো প্রয়োজনীয় তাপ সে মজুত রাখতে পারবে না।



এই দুটো কারণের জন্য বৈদ্যুতিক বাল্বকে বায়ুশূন্য করাটা খুবই প্রয়োজন। যদি কোন বাল্বের কাঁচ ভেঙে যায়, তাহলে তার ভেতরের শূন্যতা সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। তখন সেই বাল্বের ফিলামেণ্ট নিখুঁত থাকলেও তার পক্ষে আর আলো দেওয়া সম্ভব হয় না। এই পরীক্ষা তোমরা নিজেরাও করে দেখতে পারো।

সুতরাং বায়ুশূন্য বাল্বে উৎপন্ন তাপ সহ্য করতে সক্ষম, এমন ধাতুর খোঁজে হন্যে হয়ে পড়লেন এডিসন। একসময় তাঁর মনে হয়েছিলো প্লাটিনাম ধাতুর তার দিয়ে বাল্বের উপযুক্ত ফিলামেণ্ট তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু প্লাটিনাম যে বৈদ্যুতিক তাপ বেশিক্ষণ ধরে সহ্য করতে পারছে না, সেটা যাচাই করতে এডিসন খরচ করেছিলেন একটি বছরের অক্লান্ত শ্রম ও পঞ্চাশ হাজার ডলার—অর্থাৎ, আমাদের হিসেবে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা!

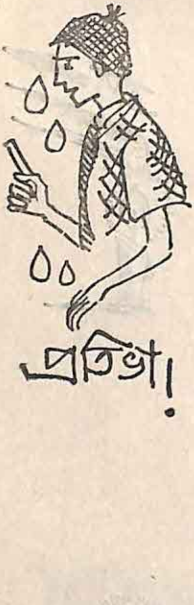


হাজার হাজার পরীক্ষার পর অভীষ্ট বস্তুর হদিস পেলেন আলভা এডিসন। একটা পোড়া সুতো! ১৮৭৯ সালের ২১শে অক্টোবর পোড়া সুতোর ফিলামেণ্ট দিয়ে একটা

বৈদ্যুতিক বাল্ব তৈরি করলেন তিনি। সেটা একনাগাড়ে চল্লিশ ঘণ্টা জ্বলেছিলো।

এরপর নিউ ইয়র্কের পথে পথে জ্বলে উঠলো এডিসনের তৈরি বৈদ্যুতিক বাল্ব। সারা পৃথিবীতে একেবারে হৈ-চৈ পড়ে গেলো।

ধীরে-সুস্থে কাজ করার মানুষ ছিলেন না এডিসন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পন্থা ছিলো কোন সমস্যাকে সবদিক থেকে খাপছাড়াভাবে আক্রমণ করা। অনেক সময় নেহাৎ অক্লান্ত প্রচেষ্টার জোরেই সফল হয়েছিলেন তিনি।



একবার এক নতুন ধরণের সঞ্চয় কোষ আবিষ্কার করতে গিয়ে আট হাজার রকম পদ্ধতিতে চেষ্টা করেও এডিসন ব্যর্থ হন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'যাক, আট হাজার রকম কায়দায় যে হয় না, সেটুকু তো অন্তত জানা গেলো!' সুতরাং, এই মহান ব্যক্তিই যে নিচের মন্তব্যটি করবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

'প্রতিভা হচ্ছে শতকরা একভাগ অনুপ্রেরণা, আর বাকি নব্বই ভাগ মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা পরিশ্রম।'

এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন টমাস আলভা এডিসন নিজেই।

জোনাথান সুইফ্‌ট্‌ ও মঙ্গলের উপগ্রহ

জোনাথান সুইফ্‌ট্‌ হলেন লিলিপুটের গল্প 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স্‌'-এর অমর লেখক। 'মঙ্গল' অর্থে মঙ্গল গ্রহ— সূর্যের থেকে দূরত্বের হিসেবে যার স্থান চতুর্থ। এবং 'উপ-গ্রহ' কথাটা নিশ্চয়ই তোমাদের খুব চেনা। এই তিনটে বিভিন্ন জিনিস কোন্‌ অদ্ভুত ঘটনাচক্রে একই সূত্রে গেঁথে গিয়েছিলো তারই হিসেব-নিকেশ এখন করতে বসেছি আমরা।

'উপগ্রহ' শব্দটার সঙ্গে আমাদের বেশি পরিচয়ের কারণ একটাই: সেটা হলো, সাম্প্রতিক কালে 'কৃত্রিম উপগ্রহ' নিয়ে নানান্‌ আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। বিশেষ করে 'অ্যাপ্‌ল্‌' ও ইনস্যাট্‌', এই দুটো 'কৃত্রিম উপগ্রহ' মহাকাশে পাঠানোর ফলে আমাদের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার দারুণ উন্নতি হয়েছে। এই কারণেই 'উপগ্রহ' শব্দটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একেবারে আস্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছে।

'উপকূল' শব্দের মধ্যে 'উপ' নামে উপসর্গটি সমীপবর্তী বা কাছাকাছি এই অর্থে ব্যবহার করা হয়। উপগ্রহ শব্দের মধ্যেও এই একই তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে। সোজা কথায়, 'গ্রহের সমীপবর্তী যে' তাকেই বলা হয় উপগ্রহ।

উপগ্রহের ইংরেজী নাম, 'স্যাটেলাইট'। এই নামের উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'স্যাটেলিস' থেকে—যার অর্থ 'সঙ্গী'। আবার স্যাটেলাইট-এর রুশ শব্দটিও আমাদের খুব চেনা— 'স্পুটনিক'। 'স্পুটনিক' শব্দের অর্থ 'ভ্রমণসঙ্গী'।



এই অর্থে, আমাদের পৃথিবীর একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ যে 'ভ্রমণসঙ্গী', তার নাম চাঁদ। পৃথিবী গ্রহের প্রতি 'পুরাতন ভৃত্যের' মত অনুগত থেকে সে চক্রাকারে তাকে পাক দিয়ে

চলেছে। প্রতি সেকেণ্ডে দশ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীকে একবার পরিক্রমা করে আসতে চাঁদের সময় লাগে সাতাশ দিনের কিছু বেশি। এই উপগ্রহটি নেহাতই 'প্রাকৃতিক' উপগ্রহ—প্রায় চারশো ষাট কোটি বছর ধরে পৃথিবীর সঙ্গী হয়ে রয়েছে। কিন্তু 'অ্যাপল' বা 'ইনস্যাট'কে মানুষ স্থাপন করেছে মহাকাশে কক্ষপথে। তারা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে চাঁদের মতো—সুতরাং তাদের বলা হয় 'কৃত্রিম' উপগ্রহ।

আমাদের সৌরজগতের মোট ন'টি গ্রহের মাত্র সাতটির উপগ্রহ আছে। বাকি দুটি গ্রহ, বুধ ও শুক্র, উপগ্রহের হাজিরা থেকে বঞ্চিত। মঙ্গলগ্রহের কিন্তু রয়েছে একজোড়া উপগ্রহ, এবং এদের প্রসঙ্গে কি করে অমরকাহিনী 'গালিভার্স ট্রাভেলস'-এর লেখক জোনাথান সুইফ্‌ট্‌ জড়িয়ে পড়েছেন সে এক আশ্চর্য ব্যাপার!

এমনিতে মঙ্গলগ্রহকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের অথবা বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্পের লেখকদের জল্পনা-কল্পনার কোন শেষ ছিল না। খালি চোখে গ্রহটিকে লালচে দেখায় বলে এর অন্য নাম 'রেড প্ল্যানেট' বা 'লাল গ্রহ'। টেলিস্কোপে নজর রেখে সহজেই বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছিলেন মঙ্গলের লালচে-কমলা রঙ ও তার গায়ে কিছু অস্পষ্ট কালো দাগ। এক সময়ে ভাবা হয়েছিল, এগুলো সমুদ্র, ফলে ল্যাটিন ভাষায় তাদের নাম রাখা হয় 'মারিয়া'। বিভিন্ন ঋতু-বদলের সময় লক্ষ্য করা গেল 'মারিয়া' তার রূপ বদল করছে। তখন বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করলেন, 'মারিয়া' হয়তো সবুজ প্রাণের ইঙ্গিত; মঙ্গলগ্রহের বসন্ত ঋতুতে তার মেরু প্রদেশ থেকে প্রচুর জল পেয়ে 'মারিয়া'র রূপান্তর ঘটছে। হয়তো মঙ্গলেও রয়েছে পৃথিবীর শ্যামল প্রাকৃতিক শোভা। কেউ কেউ বললেন, ঐ দাগগুলো আসলে গভীর খাল। কিন্তু পরে প্রমাণিত হল, ওগুলো প্রকৃতপক্ষে বড় বড় খাদ—



সম্ভবত উল্কাপাতের আঘাতে যাদের উৎপত্তি।

মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর এমন কিছু কিছু অদ্ভুত মিল দেখা গেছে, যাতে বিজ্ঞানীরা এই গ্রহকে 'পৃথিবীর ভাই' আখ্যা দিয়েছেন। সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি কিলোমিটার, এবং সূর্যকে একটি পাক ঘুরে আসতে এই 'লাল গ্রহ' সময় নেয় ছ'শো সাতাশি দিন। তবে ওজনে বা আয়তনে মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট : গ্রহটির ওজন পৃথিবীর দশভাগের এক ভাগ, আর বিষুবরেখা বরাবর ব্যাস হলো ছ'হাজার সাতশো চুরানব্বই কিলোমিটার—যেখানে আমাদের বাসভূমি পৃথিবীর ব্যাস এর প্রায় দ্বিগুণ। সূর্যকে পরিক্রমণের পথে মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর খুব কাছে আসে, তখন তার দূরত্ব হয় সাড়ে পাঁচ কোটি কিলোমিটারের কিছু বেশি। আবার যখন সে সবচেয়ে দূরে চলে যায়, তখন এই দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় দশ কোটি কিলোমিটার। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে সাড়ে পাঁচ কোটি কিলোমিটার খুব বেশি দূরত্ব নয়, ফলে তাঁরা পর্যবেক্ষণ করে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে অনেক তথ্যই জেনে ফেলেছেন।

সূর্য থেকে পৃথিবী যে তাপ ও আলো পায়, তা আমরা সহজেই সইতে পারি। মঙ্গলের বেলায়ও অবস্থাটা মোটামুটি একইরকম। গ্রীষ্মকালে মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ গোলার্ধে তাপমাত্রা হয় কুড়ি থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগে মঙ্গলগ্রহের বেশির ভাগ অঞ্চলেই তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্যেরও একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে। আবার শীতকালে এই গ্রহের মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা দাঁড়ায় আনুমানিক –৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যেতে পারে, সাইবেরিয়ার কোনো কোনো গ্রামে খুব শীতে তাপমাত্রা নেমে যায় –৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।



পৃথিবী যেমন নিজের অক্ষের ওপর একবার পাক খায় তেইশ ঘণ্টা ছাপ্পান্ন মিনিটে, তেমনি মঙ্গলগ্রহও নিজের রাত-দিন সৃষ্টি করে চব্বিশ ঘণ্টা সাঁইত্রিশ মিনিট তেইশ সেকেণ্ডে, মেরুদণ্ডের ওপর একবার পাক দিয়ে। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল আছে, এবং সেই বায়ুমণ্ডলের গভীরতা কম করেও একশো কিলোমিটার। বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে আরও ওপরে তার আয়নমণ্ডল বিস্তৃত রয়েছে তিনশো কিলোমিটার পর্যন্ত। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, এমনকি কার্বন-ডাই-অক্সাইডেরও আভাস পাওয়া গেছে।

এইসব আশ্চর্যজনক তথ্যের ভিত্তিতেই হয়তো সন্দেহ করা হয়েছিল, মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। বহু গল্প-উপন্যাসে মঙ্গলগ্রহের বিচিত্র প্রাণীদের নিয়ে কল্প-কাহিনী বোনা হয়েছে, কিন্তু সাম্প্রতিক মঙ্গহগ্রহ অভিযানের ফলে সেইসব কল্পনা অলীক প্রমাণিত হয়ে গেছে।

১৯৬৪ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত মেরিনার-৪, ৬, ৭, ৯ এবং ভাইকিং-১ ও ২ মঙ্গলগ্রহে অভিযান চালিয়ে বহু তথ্য এনে দিয়েছে আমাদের বিজ্ঞানীদের হাতে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে, আগেকার বৈজ্ঞানিক ধারণা মাত্র আংশিক সত্যি। যেমন, মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল খুব হালকা। তার ঘনত্ব পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একশো ভাগের এক ভাগ! সেখানে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ কার্বন-ডাই অক্সাইড, শতকরা তিন ভাগ নাইট্রোজেন, সামান্য আর্গন ও শতকরা ০·১৫ ভাগ মাত্র অক্সিজেন রয়েছে। এছাড়া, জলীয় বাষ্প, কার্বন মনোক্সাইড, ক্রিপ্টন, জিনন ইত্যাদিরও অল্পসল্প আভাস পাওয়া গেছে। অতএব, ভাইকিং নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নেই।



কিন্তু পুরোনো ইতিহাস সামান্য আলোচনা করলে দেখা যাবে, এক সময়ে এই মঙ্গলগ্রহ বিজ্ঞানীমহলে কিরকম উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছিল।

১৮৯২ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী ক্যামিল ফ্লামেরিয়ঁ একটা গোটা বই-ই লিখে ফেলেছিলেন যে মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীবের বাস আছে। এরপর, ১৮৯৪ সালে ফ্লামেরিয়ঁর মতামতে জোর দিয়ে সুর মেলালেন আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভাল লাওয়েল। তিনিও একটি বই প্রকাশ করে দাবি জানালেন, মঙ্গলে প্রাণ আছে। কিন্তু বহু বিজ্ঞানী লাওয়েল-এর সঙ্গে একমত হলেন না। বরং তাঁরা টেলিস্কোপে চোখ রেখে দ্বিগুণ উৎসাহে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন মঙ্গলের লালচে রুক্ষ চেহারাটা। কেউ কেউ খাল দেখতে পেলেন, কেউ বা পেলেন না, কেউ কেউ বললেন, সমস্তই দেখার ভুল। সব মিলিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকলো পুরোদমে।

১৯০৫ সালে মঙ্গলগ্রহ আবার পৃথিবীর খুব কাছাকাছি এলে লাওয়েল নতুন উদ্যমে পর্যবেক্ষণে মেতে উঠলেন। তিনি মঙ্গলের খাল ও প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে আরও দুটো বই প্রকাশ করলেন। আমেরিকার বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড এমারসন বার্নার্ড উন্নত মানের নতুন টেলিস্কোপ নিয়ে চেষ্টা করলেন লাওয়েল-এর দেখা 'খাল'গুলো দেখতে। মাউণ্ট উইলসনে গিয়ে প্রায় এক মাস ধরে তিনি অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে গেলেন, কিন্তু ফল পেলেন না। অতএব জল্পনা-কল্পনা হয়েই চললো। কিন্তু ১৯৬৮ সালে মেরিনার-৬ ও মঙ্গলের প্রায় দুশো ছবি তুলে পাঠিয়ে দিল বিজ্ঞানীদের কাছে, আর সেই সঙ্গেই লাওয়েল ও ফ্লামেরিয়ঁর ধারণা চুরমার হয়ে গেল। পুরোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের গায়ে একটা উজ্জ্বল দাগ দেখে তার ল্যাটিন নাম দিয়েছিলেন 'নিক্স অলিম্পিকা' বা 'স্বর্গের তুষার'। কিন্তু ১৯৭১ সালে মেরিনার-৯ প্রমাণ করে দিল সেটা এক প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। পনেরো কিলোমিটার উঁচু, পাঁচশো কিলোমিটার বিস্তৃত এক বিশাল আগ্নেয়গিরি। পৃথিবীর



সবচেয়ে বড় যে আগ্নেয়গিরি, তার আয়তন মঙ্গলের এই মহা-আগ্নেয়গিরির তিরিশ ভাগের মাত্র একভাগ! এছাড়া মঙ্গলগ্রহে দেখা গেছে এক অতি গভীর খাদ, যার দৈর্ঘ্য হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্থের সমান, এবং গভীরতা আমেরিকার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের প্রায় চারগুণ!

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে এত অনুসন্ধানের ফলেই কিন্তু হদিশ পাওয়া গেল তার একজোড়া উপগ্রহের—অর্থাৎ, মঙ্গলের 'চাঁদ'। পৃথিবীর চাঁদকে দেখেই মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, আর কোনো গ্রহের এরকম 'চাঁদ' নেই তো? একথা ভাবামাত্রই মানুষ টেলিস্কোপ তাক করল আকাশে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের দুটি গ্রহ শুক্র ও বুধ, কিন্তু ওরা সূর্যের এত কাছে যে ছোট ছোট উপগ্রহ থাকলেও উজ্জ্বল আলোর ধাঁধায় তাদের দেখা যায়নি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মানুষের লক্ষ্য হল পরবর্তী নিকটতম গ্রহ মঙ্গল।

১৮৭৭ সালে এল এক নাটকীয় মুহূর্ত। মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর এত কাছে এসে পড়েছে যে টেলিস্কোপে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখা যাবে সহজেই। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা দূরের গ্রহগুলোর 'চাঁদ'-এর কথা জেনে গেছেন: যেমন শনির আটটা উপগ্রহ, বৃহস্পতির যে চারটে 'চাঁদ' সেটা প্রমাণ করেছেন গ্যালিলিও, নেপচুনের একটা এবং ইউরেনাসের চার চারটে উপগ্রহ।



কঠোর ধৈর্য ও পরিশ্রম সহকারে মঙ্গলের দুটো উপগ্রহ আবিষ্কার করলেন মার্কিন বিজ্ঞানী অ্যাসাফ হল্। ১৮৭৭ সালের আগস্ট মাসে হল্ অনুসন্ধান শুরু করেন। মাসের এগারো তারিখ পর্যন্ত তিনি কিছুই দেখতে পাননি। ফলে ঠিক করলেন, হাল ছেড়ে দেবেন। বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে বললেন, আর নয়, অনেক হয়েছে।

উত্তরে তাঁর স্ত্রী উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'আর একটা

রাত অন্তত দেখো—ফল তুমি পাবেই।'

কোন এক অজানা কারণে স্ত্রীর কথা রাখলেন অ্যাসাফ হল্ এবং তার পুরস্কারও পেলেন হাতেনাতে। বারো তারিখ থেকে আকাশ মেঘলা হয়ে যাওয়ায় ধৈর্য ধরে বসে রইলেন তিনি। শুধুই উসখুস করতে লাগলেন। অবশেষে, পাঁচদিন পর মেঘ কেটে গেল। ১৬ তারিখে হল্ প্রথম উপগ্রহটা দেখতে পেলেন, আর তার পরদিন রাতে খুঁজে পেলেন দ্বিতীয়টা।

মঙ্গলগ্রহের ইংরেজী নাম 'মার্স'। এই নাম রাখা হয়েছে গ্রীক পুরাণের যুদ্ধদেবতা 'মার্স'-এর নামে। সেই দেবতার দুই ছেলে—নাম 'ডেইমোস' ও 'ফোবোস'। ফলে অ্যাসাফ হল্ খুব যুক্তিসঙ্গত ভাবেই মঙ্গলগ্রহের দুই সন্তান, অর্থাৎ, উপগ্রহ দুটির নাম রাখলেন, 'ডেইমোস' ও 'ফোবোস'। শুনলে অবাক লাগবে, 'ডেইমোস'-এর অর্থ 'সন্ত্রাস', আর 'ফোবোস'-এর অর্থ হলো 'আতঙ্ক'।

ডেইমোস ও ফোবোস-এর চেহারা আমাদের চাঁদের মত ঠিক গোল নয়, বরং খাপছাড়া—অনেকটা লম্বাটে আলুর মত। মঙ্গলের কাছাকাছি রয়েছে ফোবোস, তার গড় দূরত্ব ন' হাজার তিনশো আশি কিলোমিটার, এবং প্রতি ৭·৬৫ ঘণ্টায় সে মঙ্গলগ্রহকে একবার করে পরিক্রমা করে। ফোবোস-এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ যথাক্রমে ২৭, ২১ ও ১৯ কিলোমিটার; ওজন দশ লক্ষ কোটি মেট্রিক টন।

ফোবোস-এর ভাই ডেইমোস রয়েছে মঙ্গলগ্রহ থেকে তেইশ হাজার পাঁচশো কিলোমিটার দূরে। প্রতি তিরিশ ঘণ্টায় সে মঙ্গলকে একবার করে পাক খায়। আর আয়তনে মোটামুটি ফোবোসের আট ভাগের একভাগ।



ডেইমোস ও ফোবোস সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ফল জানার পর এবারে আমরা জোনাথান সুইফ্‌টের

অবাক করে দেওয়া ঘটনায় ফিরে আসি।

আইরিশ সাহিত্যিক জোনাথান সুইফ্‌ট্‌ 'গালিভার্স ট্রাভেলস' প্রকাশ করেন ১৭২৬ সালে, উনষাট বছর বয়েসে। গালিভারের গল্পে 'লাপুটা' নামে এক আজব দেশের কাহিনী লেখা আছে। তাতে বলা হয়েছে, সেই দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মঙ্গলগ্রহের 'চাঁদ'—তা আবার একটি নয়, দুটি। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে সুইফ্‌ট্‌-এর ভালই ধারণা ছিল। তার প্রমাণ 'গালিভার'-এর কাহিনীতে উপগ্রহ দুটির বর্ণনা। প্রথমত, জোনাথান সুইফ্‌ট্‌ যে দু-দুটো উপগ্রহ কল্পনা করেন, তার ভিত্তি ছিল খুব সহজ হিসেব: পৃথিবীর উপগ্রহের সংখ্যা একটি, আর তখনও পর্যন্ত জানা ছিল বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ আছে চারটি। যেহেতু মঙ্গলগ্রহ রয়েছে পৃথিবী ও বৃহস্পতির মাঝখানে, সেহেতু ঐকিক নিয়মে তার উপগ্রহ হবে দুটি। এখানে মনে রাখতে হবে, ডেইমোস ও ফোবোস-এর প্রকৃত আবিষ্কারের দেড়শো বছর আগেই সুইফ্‌ট্‌ এই বিস্ময়কর ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

সুইফ্‌ট্‌-এর বইয়ে আরও আছে, প্রথম উপগ্রহটির দূরত্ব মঙ্গলগ্রহের ব্যাসের তিনগুণ—অর্থাৎ কুড়ি হাজার চারশো কিলোমিটার, এবং সেটি দশ ঘণ্টায় একবার মঙ্গলগ্রহকে পরিক্রমা করে। আর দ্বিতীয় উপগ্রহটির দূরত্ব মঙ্গলগ্রহের ব্যাসের পাঁচগুণ—অর্থাৎ, চৌত্রিশ হাজার কিলোমিটার, এবং মঙ্গলকে পরিক্রমা করছে সাড়ে একুশ ঘণ্টায় একবার। এবং দুটি উপগ্রহই কেপলার ও নিউটনের সূত্র মেনে চলছে।



প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে সুইফ্‌ট্‌-এর অনুমান মিলিয়ে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে শুধুমাত্র কল্পনাকে মূলধন করে তিনি সত্যের কত কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই অনুমান পরে আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় মিলে

যাওয়ায় অনেক বিজ্ঞানীই ঠাট্টা করে মন্তব্য করেছিলেন, 'সুইফ্‌ট্‌ ছিল মঙ্গলগ্রহের লোক—আগে থেকেই সব জানত!'

জোনাথান সুইফ্‌ট্‌-এর এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অদ্ভুত দূরদর্শিতার প্রতি সম্মান জানাতে ডেইমোস-এর গায়ে যে ছোট ছোট খাদ রয়েছে, তারই একটার নাম রাখা হয়েছে, 'সুইফ্‌ট্‌'।

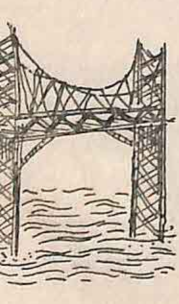
প্রসঙ্গত, বলে রাখি, কিছুদিন আগেই প্রমাণ পাওয়া গেছে বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যা চোদ্দটি—চারটি নয়। গ্যালিলিওর সময়ে টেলিস্কোপ ততো উন্নত ছিলো না বলেই মাত্র চারটি উপগ্রহ তাঁর নজরে পড়েছিলো। তবে টেলিস্কোপে চোখ না রেখেই জোনাথান সুইফ্‌ট্‌ যে চমকে দেওয়া ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তা কিন্তু ভুল প্রমাণিত হয়নি।



কুচকাওয়াজের আওয়াজ

কুচকাওয়াজ ব্যাপারটা সব সময়েই জড়িয়ে থাকে সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে। তারা যখন দল বেঁধে একই ছন্দে পা ফেলে এগিয়ে চলে তখনই তাকে বলা হয় কুচকাওয়াজ। কুচকা-ওয়াজের আওয়াজ নিশ্চয়ই হয়, তবে সেটা অন্যান্য শব্দব্রহ্মের চেয়ে কিছুটা আলাদা। কারণ কুচকাওয়াজের শব্দটা হয়ে থাকে একটা নির্দ্দিষ্ট ছন্দে—অর্থাৎ, একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পরে পরেই শোনা যায় সৈন্যদের সম্মিলিত পা ফেলার শব্দ। হয়তো মিনিটে তিরিশ বার, কি চল্লিশ বার, হয়তো বা পঞ্চাশ বার করেও পা ফেলতে পারে সৈন্যদল। সংখ্যাটি যাই হোক না কেন, কুচকাওয়াজের সময় এই সংখ্যার বিশেষ হের-ফের হয় না। আর সেই কারণেই কোন ব্রিজের ওপর দিয়ে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলাটা নিষেধ, নইলে ব্রিজ ভেঙে পড়তে পারে। সুতরাং কুচকাওয়াজের পথে সৈন্যদল যদি কোন সেতুর মুখোমুখি হয়, তাহলে সেনাপতি তাদের নির্দেশ দেন সাধারণভাবে হেঁটে ব্রিজ পেরিয়ে যেতে। সোজা কথায়, কুচকাওয়াজের শব্দের যেন কোন ছন্দ না থাকে!

কুচকাওয়াজের ফলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাকে আমরা পৌনঃপুনিক বা পুনরাবৃত্ত তরঙ্গ বলতে পারি। এই তরঙ্গ কোন সেতুর পক্ষে যে কতোটা বিপজ্জনক, কয়েকটা ঘটনার কথা বললেই সেটা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।



১৮৩১ সালের ঘটনা। ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের বুক চিরে বয়ে গেছে আরওয়েল নদী। তার ওপরে সগৌরবে জাঁকিয়ে রয়েছে ব্রফ্‌টন সাস্‌পেনসন ব্রিজ। মাত্র ষাট

জন সৈন্য ঐ ব্রিজের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে কুচকাওয়াজ করে। হঠাৎই ঘটলো এক দুর্ঘটনা। ব্রিজ পড়লো ভেঙে। বহু লোক তাতে আহত হয়েছিলো।

দ্বিতীয় ঘটনা ১৮৫০ সালের। ঘটনাস্থল ফ্রান্সের অ্যাঙ্গার্স সাস্‌পেনসন ব্রিজ। এক গভীর গিরিখাতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সেতুটা। পাঁচশো ফরাসী সৈন্যের এক ব্যাটালিয়ান ব্রিজের ওপর দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছিলো। হঠাৎই কোনরকম জানান না দিয়ে ব্রিজ ভেঙে পড়লো নিচের অতল গিরিখাতে। আর এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো ২২৬ জন মানুষ।

১৯৪০ সালে, অর্থাৎ, মোটামুটি সাম্প্রতিককালে ভেঙে পড়েছে আমেরিকার ট্যাকোমা ন্যারোস ব্রিজ। এই ব্রিজটা কিন্তু সৈনিকদের কুচকাওয়াজের জন্য ভেঙে পড়েনি। কারণ ততোদিন মানুষ জেনে গেছে ব্রিজের ওপর কুচকা-ওয়াজের বিপদের কথা। ট্যাকোমা ব্রিজ ভেঙে পড়েছিলো হাওয়ার দাপটে। তবে আসল কারণটা মোটামুটি একই ছিলো। কুচকাওয়াজের ফলে যে পৌনঃপুনিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, এখানে হাওয়ার বেগ সেই একই ধরণের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলো।

ট্যাকোমা ব্রিজের ঘটনাটা একই সঙ্গে বেশ রহস্যময় অথচ মজার।

১৯৪০ সালের পয়লা জুলাই ওয়াশিংটনের ট্যাকোমা ন্যারোস ব্রিজের উদ্বোধন করা হলো। যানবাহন চলাচলের জন্য ব্রিজ খুলে দেওয়া হলো সেই দিনই। প্রথম দিন থেকেই একটা অদ্ভুত জিনিস সবাই লক্ষ্য করলো : ব্রিজটা ওপরে-নিচে দুলছে। ব্রিজের মাঝখানটা একবার ওপরে উঠছে, আর একবার নিচে নামছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে ট্যাকোমা ব্রিজের ডাক নাম হয়ে গেলো 'গ্যালোপিং গ্যার্টি'। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এই বিচিত্র লাফানির



জন্যই ট্যাকোমা ব্রিজে দর্শকের ভিড় বাড়তে শুরু করলো। শত শত মাইল দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে আসে দর্শকের দল। তারপর ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে তার অদ্ভুত লাফানি।

ট্যাকোমা ব্রিজে উঠলে টিকিট কাটতে হতো দর্শকদের। ফলে চার মাস ধরে ব্রিজ কর্তৃপক্ষ দারুণ ব্যবসা করলেন। যতো দিন যায় কর্তা-ব্যক্তিরা ততো নিশ্চিন্ত হন যে হাজার লাফালেও ব্রিজটার আর ভেঙে পড়বার ভয় নেই। ব্রিজের জন্য একটা বীমা করানো হয়েছিলো। কর্তৃপক্ষ ভাবলেন, বীমার আর প্রয়োজন নেই। ঠিকই করলেন যে সেটা তাঁরা বাতিল করে দেবেন।

কিন্তু সেই বছরেই নভেম্বর মাসের সাত তারিখে ঘটলো এক অভূতপূর্ব দুর্ঘটনা। সকাল সাতটা থেকে তিন ঘণ্টা ধরে ব্রিজে যেন ঢেউ খেলতে লাগলো। ব্রিজের অংশগুলো একবার তিন ফুট ওপরে উঠছে, একবার তিন ফুট নিচে নেমে যাচ্ছে। ঠিক দশটার সময়, কি যেন একটা ভেঙে গেলো, আর ব্রিজটা দুলতে শুরু করলো পাগলের মতো। কখনো ব্রিজের রাস্তার একটা দিক অন্য দিকের চেয়ে উঠে যাচ্ছে আঠাশ ফুট ওপরে; আবার কখনও নেমে যাচ্ছে আঠাশ ফুট নিচে। সাড়ে দশটা নাগাদ ব্রিজে ফাটল ধরতে শুরু করলো। তারপর, ঠিক এগারোটা বেজে দশ মিনিটে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো ট্যাকোমা ব্রিজ! সৌভাগ্য-বশতঃ ভেঙে পড়ার সময়ে মাত্র একটাই গাড়ি ছিলো ব্রিজের ওপর। গাড়ির মালিক স্থানীয় খবরের কাগজের এক সাংবাদিক। গাড়িতে তার সঙ্গী ছিলো তার পোষা কুকুর। ব্রিজটা যখন প্রচণ্ড ভাবে দুলতে শুরু করে, তখন গাড়ি ও কুকুর ফেলে রেখে সাংবাদিকটি কোন রকমে পিঠটান দেয়। আহত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে সাংবাদিকটি কোন রকমে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে নিজের



প্রাণ বাঁচায়। ফলে ব্রিজ ভেঙে পড়ার সময় একই সঙ্গে তলিয়ে গেলো তার গাড়ি ও কুকুর। এই একটি মাত্র প্রাণীই নিহত হয়েছিলো সেই দুর্ঘটনায়।

ট্যাকামো ব্রিজ যখন ভয়ঙ্করভাবে দুলতে শুরু করে তখন ব্রিজ কর্তৃপক্ষ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এফ. বি. ফারকোয়ার্সনকে খবর দেন। ব্রিজ তৈরি হওয়ার আগে অধ্যাপক ফারকোয়ার্সন ব্রিজের একটা বৈজ্ঞানিক মডেল ডিজাইন করে তার ওপর অসংখ্য পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষার ভিত্তিতেই তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ট্যাকোমা ব্রিজের ভেঙে পড়ার কোন ভয় নেই। ব্রিজ ভেঙে পড়ার একটু আগেও ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে নানান বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন অধ্যাপক ফারকোয়ার্সন। তখন ব্রিজের দুলুনি আঠাশ ফুট ছাড়িয়ে গেছে। সেই অবস্থাতেও অধ্যাপক কিন্তু একবারের জন্যও ভাবেননি, ব্রিজ ভেঙে পড়তে পারে। যখন দুলুনি প্রলয়ংকর হয়ে উঠেছে তখন আর ঝুঁকি না নিয়ে অধ্যাপক ব্রিজ ছেড়ে চলে আসেন। ব্রিজের ওপরে তিনিই ছিলেন শেষ মানুষ।

ট্যাকোমা ব্রিজের মুখেই একটা বিশাল সাইনবোর্ড লাগানো ছিলো। তাতে স্থানীয় একটি ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনে লেখা ছিলো, 'ট্যাকোমা ব্রিজের মতোই নিরাপদ ব্যাঙ্ক।' ব্রিজ ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে ছুটে এলেন সেই ব্যাঙ্কের অফিসার। তড়িঘড়ি সাইনবোর্ডটা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করলেন।



ট্যাকোমা ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর ওয়াশিংটনের রাজ্যপাল এক বিরাট সভায় বেশ আবেগ ও আশ্বাসে ভরা বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন, 'আমরা ঐ একই ব্রিজ ঠিক একই ভাবে আবার তৈরি করবো।' একথা কানে আসার পর আমেরিকার প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার ভন কারম্যান রাজ্যপালকে

টেলিগ্রাম করে জানালেন, 'আপনি যদি ঐ একই ব্রিজ ঠিক একই ভাবে আবার তৈরি করেন, তাহলে সেটা ঐ একই নদীতে ঠিক একইভাবে আবার ভেঙে পড়বে!'

এবারে দেখা যাক ট্যাকোমা ব্রিজ কেন ভেঙে পড়েছিলো, বা সেতুর ওপরে কুচকাওয়াজের ফলে কেন দুর্ঘনার ভয় থাকে।

একটা সরু তার যদি তোমরা টান টান করে বেঁধে তার মাঝামাঝি জায়গায় টংকার দিয়ে ছেড়ে দাও, তাহলে কি হবে? তারটা ওপরে নিচে কাঁপতে থাকবে। এই কাঁপুনিকে বলা হয় অনুপ্রস্থ কম্পন বা 'ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশান'। কাঁপতে কাঁপতে একসময় তারটা কিন্তু আবার স্থির অবস্থায় ফিরে আসবে।

তারের জায়গায় যদি একটা ধাতুর তৈরি রড নিয়ে তার মাঝামঝি জায়গায় আঘাত করা যায়, তাহলে রডটাও অনুপ্রস্থ কম্পন শুরু করবে—যদিও রডের কম্পন তারের মতো সহজে খালি চোখে দেখা যাবে না। একসময় এই কাঁপুনি থামবে। কারণ যে জিনিসটা কাঁপে, ঘর্ষণ ও অন্যান্য কিছু বল তাকে ভেতর থেকে বাধা দেয়। এই বাধাকে বলা হয় 'ড্যাম্পিং ফোর্স' বা অবমন্দন বল। অবমন্দন বল না থাকলে রডটা অনন্তকাল ধরে কেঁপে চলতো। আর এই কাঁপুনির হারকে বলা হতো রডের স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক বা 'ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সী'।

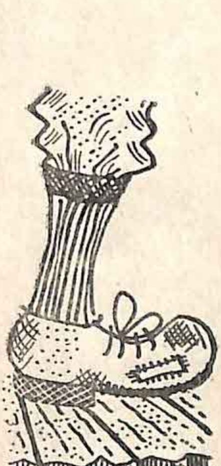
এখন মনে করা যাক, বাইরে থেকে এমন একটা বল প্রয়োগ করা হলো যাতে রডের কাঁপুনি না কমে বরং বাড়তে শুরু করলো। তাহলে অনুপ্রস্থ তরঙ্গের বিস্তার ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ, রডের মাঝামাঝি অংশের ওপরে-নিচে ওঠানামার মাপ ক্রমে বড় হতে থাকবে। আর এক-সময় দেখা যাবে, কাঁপুনি পরিণত হয়েছে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে, এবং দু'পাশের বাঁধন থেকে হয়তো খুলেই পড়ে যাবে



রডটা। এই ঘটনাকে বলা হয় 'রেসোন্যান্স' বা অনুনাদ।

ধাতুর রডের বদলে যদি কোন ব্রিজকে আমরা কল্পনা করে নিই তাহলেই খুঁজে পাওয়া যাবে ট্যাকোমা ব্রিজের ভেঙে পড়ার কারণ।

সৈন্যদল যখন কোন সেতুর ওপর দিয়ে কুচকাওয়াজ করে এগোয়, তখন ধাতুর রডের মতোই ব্রিজের অনুপ্রস্থ কম্পন শুরু হয়। ব্রিজটা ওপরে-নিচে ওঠানামা করতে থাকে। যখন ব্রিজ নিচে নামছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই যদি সৈন্যরা মিলিত ভাবে পায়ের আঘাত করে ব্রিজের ওপর, তাহলে তার নামার পরিমাণ একটু হলেও বেড়ে যাবে। আবার ব্রিজটা যখন কাঁপুনির ফলে ওপরে উঠছে, তখন যদি সৈন্যদল তাদের পায়ের চাপ তুলে নেয়, তাহলে ওপরে ওঠার পথে ব্রিজটা কোন বাধা পাবে না। কিন্তু নামার সময় আবার পড়বে সৈন্যদের পায়ের আঘাত, আর ওঠার সময় তারা তুলে নেবে পায়ের চাপ। এইভাবে ব্রিজের ওঠা-নামার পরিমাণ ক্রমে বাড়তে থাকবে। কারণ সৈন্যদল পা ফেলছে ঠিক ব্রিজের কাঁপুনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ফলে ব্রিজের কাঁপুনিকে তারা ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে সাহায্য করছে। এক্ষেত্রে ব্রিজের অবমন্দন বল কাঁপুনি থামানোর ব্যাপারে সাহায্য করে উঠতে পারে না। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হয় অনুনাদ।



সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্রিজের কাঁপুনির হারের সঙ্গে সৈন্যদলের কুচকাওয়াজের ছন্দ মিলে গেলেই সর্বনাশ। কাঁপুনি বাড়তে বাড়তে একসময় ব্রিজ ভেঙে পড়বেই! যেহেতু সৈন্যদের সকলের পা একই সঙ্গে নির্দিষ্ট ছন্দে আঘাত করতে থাকে ব্রিজের ওপর, সেহেতু এই ছন্দময় আঘাতকে বলা যেতে পারে পৌনঃপুনিক বা পুনরাবৃত্ত কম্পন। এই কম্পনের হার বা কম্পাঙ্ক সেতুর স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সঙ্গে মিলে যায়।

ট্যাকোমা ব্রিজের ওপর দিয়ে সৈন্যদল কুচকাওয়াজ করে না গেলেও হাওয়ার দাপট তৈরি করেছিলো পুনরাবৃত্ত কম্পন। আর সেই কম্পনের হার মিলে গিয়েছিলো ট্যাকোমা ব্রিজের স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সঙ্গে। ফলে ব্রিজের ওপরে-নিচের দুলুনি আঠাশ ফুটকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।



অনেক সময় সৈন্যদলের কুচকাওয়াজকে কাজে লাগিয়ে কোন মঞ্চ, কাঠামো বা সেতু কতোটা মজবুত সেটা পরীক্ষা করে দেখা হয়। রাণী ভিক্টোরিয়ার তত্ত্বাবধানে ইংল্যাণ্ডে একাধিকবার এধরণের পরীক্ষা করা হয়েছে।

যুগোস্লাভিয়ার বিজ্ঞানী নিকোলা টেস্‌লা পৌনঃপুনিক তরঙ্গ নিয়ে বেশ কয়েকটি পরীক্ষামূলক গবেষণা করেছিলেন।

টিভি-তে যা দেখা যায় না

টেলিভিশনে নানান ছবি তোমরা রোজই দেখছো। কখনও স্থিরচিত্র, কখনও বা চলচ্চিত্র। ঠিক যেন সিনেমার পর্দায় দেখা ছবি! কিন্তু খুব কাছ থেকে যদি টেলিভিশনের প্রত্যেকটি ছবিকে বেশ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করো, তাহলে দেখতে পাবে ছবিগুলো তোমার নজরে কেমন যেন অস্পষ্ট লাগছে। অসংখ্য সরু সরু সমান্তরাল রেখা যেন টিভি-র ছবিগুলোকে আড়াআড়ি চিরে দিয়েছে। অথচ একটু দূরে চোখ নিয়ে গেলেই এই সরু সরু লাইনগুলো আর মোটেও দেখা যায় না; টিভি-র ছবির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আর ছবিগুলোও তখন বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। কখনও কি ভেবে দেখেছো, এরকম অদ্ভুত ব্যাপারটা কেন হয়? কি রহস্য ঐ সরু অস্পষ্ট রেখাগুলোর?

উত্তরটা জানতে হলে প্রথমে আমাদের 'হাফ-টোন' ছবির রহস্য বুঝতে হবে।

সাধারণতঃ যেসব ফটোগ্রাফ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা অবস্থায় তোমরা দেখে থাকো, সেগুলোকেই বলা হয় হাফ-টোন ছবি। এ ধরণের কোন ছবিকে যদি চোখের খুব কাছে রেখে চুলচেরা নজরে পরীক্ষা করে দেখো, তাহলে লক্ষ্য করবে খুব ছোট ছোট অসংখ্য বিন্দু বা ফুটকি দিয়ে গোটা ছবিটা তৈরি—অনেকটা ইট গেঁথে বাড়ি তৈরি করার মতো। ক্যামেরায় তোলা ছবিতে কিন্তু এই ফুটকির জটলা খুঁজে পাওয়া যায় না; কারণ সেখানে ওদের দরকার পড়ে না। অথচ যখনই কোন ফটোগ্রাফ কাগজে ছাপার প্রয়োজন হয়, তখন এই ফুটকির দঙ্গলের ডাক পড়ে।



তোমরা হয়তো জানো কোন ছবি ছাপাতে গেলে আগে তার একটা ছাঁচ তৈরি করা দরকার—যার পোষাকী নাম হলো 'ব্লক'। ছাঁচটা তৈরি হয় ধাতুর পাত দিয়ে। তারপর তাতে কালি মাখিয়ে যতো খুশি কাগজে ছাপ তুলে যাও—সেগুলোই হবে তোমাদের ছাপা ছবি।

ক্যামেরায় ফটো তোলার সময় আলোর পরিমাণ কম-বেশি হয়ে ফটোগ্রাফের ওপর আলো-ছায়ার খেলা তৈরি হয়। কিন্তু ফটোগ্রাফের ধাতুর ছাঁচের ওপর কালি লাগিয়ে যখন ছাপ তোলা হয়, তখন আলো-ছায়া কম-বেশি করার সহজ উপায় হলো কালির পরিমাণ কম-বেশি করা। ছাঁচে বা ব্লকে কালি মাখানোর সময় কোথাও কম কালি, কোথাও বা বেশি কালি, এরকমভাবে কালির হেরফের ঘটানো সম্ভব হয় না। তার বদলে কায়দাটা করা হয় ছাঁচের ওপরেই। গোটা ফটোগ্রাফের ছাঁচটা তৈরি হয় ছোট ছোট অসংখ্য ধাতব ফুটকি দিয়ে। ফটোগ্রাফের যে জায়গাটা কালো অংশ, সেখানে ফুটকিগুলো খুব ঘন, অর্থাৎ, গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে। আর যেখানটায় আলো বেশী, অর্থাৎ সাদাটে, সেখানে ফুটকির সংখ্যা থাকে খুবই কম। ফলে কাগজে কালির ছাপও পড়ে কম। সোজা কথায়, ফুটকির ঘনত্বের যেমন যেমন হেরফের হবে, কাগজে ছাপা ছবির কালির ঘনত্বও ঠিক তেমন তেমন ভাবে পালটে যাবে।

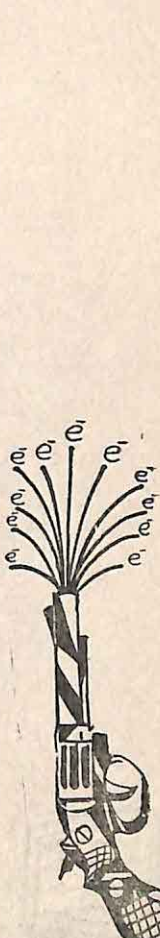


কাগজে ছবি ছাপার মতো টিভি-র পর্দায় যেসব ছবি 'ছাপা' হয়, তাদের আলো-ছায়ার হেরফের ঘটায় ঐ সরু সরু লাইনগুলো। তবে টিভি-র বেলায় লাইনের সংখ্যার কম-বেশি হয় না। বরং লাইনগুলো জায়গায় জায়গায় সাদা বা কালো হয়ে গিয়ে সবাই মিলে গোটা ছবিটা তৈরি করে।

টেলিভিশনের পর্দাটি কাঁচের তৈরি। তবে কাঁচের

ভেতরের পিঠে 'ফস্‌ফর' নামে একটি প্রতিপ্রভ পদার্থের আস্তরণ লাগানো থাকে। এই প্রতিপ্রভ আস্তরণের ফলে ইলেকট্রন কণা টিভি-র পর্দার কোন একটি জায়গায় আঘাত করলেই সেখান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। যে সরু সরু লাইনগুলোর কথা আগে বলেছি, সেই লাইনগুলো আসলে ইলেকট্রন কণার স্রোত দিয়ে তৈরি। ইলেকট্রন কণার আঘাতে তৈরি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোর বিন্দু দিয়ে গড়ে ওঠে লাইনগুলোর উজ্জ্বল অংশ। আর যেখানে ইলেকট্রন কণার সংখ্যা খুব কম, সেখানে তৈরি হয় লাইনগুলোর অন্ধকার অংশ। এই আলো এবং অন্ধকার একজোট হয়েই টেলিভিশন পর্দার গোটা ছবিটাকে রূপ দেয়।

এখন প্রশ্ন হলো, এই ইলেকট্রন কণাগুলো আসে কোথা থেকে, বা তাদের সংখ্যার হেরফেরই বা ঘটে কেমন করে! প্রথমত, টিভি-র ভেতরে ইলেকট্রন তৈরির ব্যবস্থা থাকে। একটা ইলেকট্রন-গান বা ইলেকট্রন-বন্দুক দিয়ে ইলেকট্রন কণার তীক্ষ্ণ ফলা এসে পড়ে টিভির পর্দায়। তখন আমরা টেলিভিশনের পর্দায় কোন ছবি না দেখতে পেলেও পর্দাটিকে আলোকিত অবস্থায় দেখি। যদি এমন কোন ব্যবস্থা করা যায় যাতে পর্দায় এসে আছড়ে পড়া ইলেকট্রন কণার সংখ্যা কম-বেশি হয়, তাহলেই পর্দায় ফুটে উঠবে আলো-ছায়ার খেলা। তাতে আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে। ইলেকট্রন কণার সংখ্যা 'কম-বেশি' করার দায়িত্ব নেয় 'ভিডিও-সিগনাল' বা 'চিত্র-সংকেত'। টেলিভিশন ক্যামেরায় যে ছবি ধরা হয় তাকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিণত করা হয় ভোল্টেজ-সিগনাল-এ। একেই আমরা বলি ভিডিও-সিগনাল। টেলিভিশন টাওয়ার থেকে ভিডিও-সিগনালকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রেরণ করা হয় চারিদিকে। আমাদের টিভি-র অ্যানটেনা সেই চিত্র-সংকেত গ্রহণ করে পাঠিয়ে দেয় টেলিভিশনের ভেতরে। সেখানে চিত্র-

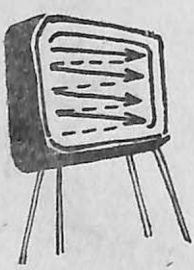


ইলেকট্রন বন্দুক

সংকেতের তীব্রতা অনুযায়ী কম-বেশি হয় ইলেকট্রন-গান থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রন-স্রোতের বর্শা। ঠিক যেন রিং মাস্টারের ইশারায় ওঠা-বসা করছে সার্কাসের বাঘ! সুতরাং এতো সব কাণ্ডের পর চিত্র-সংকেত অনুযায়ী ইলেকট্রনের কণা এসে আঘাত করে টেলিভিশনের পর্দায় এবং টেলিভিশন টাওয়ারের মাধ্যমে পাঠানো ছবিটা আমরা দেখতে পাই।

লিখতে এতোটা সময় লাগলেও আসলে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে আলোর গতিতে। অর্থাৎ, সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে; ফলে সবকিছু যেন সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে যায় বলে মনে হয়।

টেলিভিশনে ইলেকট্রন-বন্দুক থাকে একটাই। আর তা থেকে সূচীতীক্ষ্ণ ইলেকট্রনের স্রোত বর্শার মতো এসে বেঁধে টিভি-র পর্দায়। তাহলে গোটা পর্দাটা আলোকিত হয় কেমন করে? উপায়টা খুব সহজ। ইলেকট্রন-বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনের বর্শা সরু সরু সরলরেখা এঁকে চলে পর্দার ওপরে। এই আঁকার কাজটি সে করে অত্যন্ত দ্রুত গতিতেঃ ঘণ্টায় তিরিশ হাজার কিলোমিটার বেগে। এই গতিবেগে চলতে পারলে তোমরা মাত্র একঘণ্টা কুড়ি মিনিটে আমাদের পৃথিবীটাকে একটা পাক মেরে আসতে পারবে। ফলে কার্যত আমরা যা দেখি সেটা হলো, টিভি-র গোটা পর্দাটাই আলোকিত হয়ে উঠেছে ইলেকট্রন-বর্শার আঁকিবুকিতে। যেন সূক্ষ্ম কোন হোস পাইপ দিয়ে কেউ ইলেকট্রন কণায় ভাসিয়ে দিয়েছে টিভি-র পর্দাকে।



টিভি-র পর্দার একেবারে বাঁদিকের কোণ থেকে ইলেকট্রন কণার স্রোত পথ চলতে শুরু করে। বাঁদিক থেকে ডান দিকে পথ চলে পর্দার ডান প্রান্তে এসে পৌঁছলেই তৈরি হয়ে যায় একটা অনুভূমিক ইলেকট্রন-রেখা। তারপর

সেই কণার স্রোত চোখের পলকে লাফিয়ে আবার চলে যায় পর্দার বাঁ প্রান্তে—তবে প্রথমবারের চেয়ে একটু নিচে। শুরু হয় তার দ্বিতীয় দফার পথ চলা : বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। এইভাবে বারবার সে একই দিকে লক্ষ্য রেখে পথ চলতে থাকে।

বই পড়ার সময় তোমাদের চোখ যেভাবে এক লাইন থেকে আর এক লাইনে সরে যায়, টেলিভিশনের ইলেকট্রন-রশ্মির চলাফেরাও ঠিক সেইরকম। দুরন্ত গতিতে সরু সরু রেখাগুলো এঁকে চলে সে। যদি এই সূক্ষ্ম সমান্তরাল রেখাগুলো তোমরা কঠোর পরিশ্রমে গুণে ফেলতে পারো, তাহলে দেখবে তাদের সংখ্যা ঠিক ৬২৫। অর্থাৎ, এই ৬২৫টা লাইন সবসময় তৈরি করে দেয় টেলিভিশনের ছবি।

ছ'শো পঁচিশটা রেখা টানতে ইলেকট্রন-বর্শা সময় নেয় মাত্র এক সেকেণ্ডের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ! অর্থাৎ, $\frac{১}{২৫}$ সেকেণ্ডে পর্দায় একটি করে ছবি তৈরি হয়। আরো সোজাভাবে বলতে গেলে, এক সেকেণ্ডে তোমরা দেখতে পাও পঁচিশটা ছবি—যার কেতাবী নাম 'ফ্রেম'। সুতরাং সেক্ষেত্রে 'ফ্রেম-ফ্রিকোয়েন্সী' বা 'চিত্র-কম্পাঙ্ক' হলো পঁচিশ।

যে ৬২৫টা লাইনের কথা তোমাদের বললাম, অথবা 'চিত্র-কম্পাঙ্কের' বিশেষ সংখ্যাটি, ২৫, এ দুইয়ের কোনটাই কিন্তু আন্দাজে ঠিক করা হয়নি। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বিজ্ঞানীরা এই সংখ্যা দুটো বের করেছেন। সংখ্যা দুটোর সঙ্গে যা কিছু সম্পর্ক সবই কিন্তু আমাদের চোখের।

কোন জিনিস যখন আমরা দেখি, তখন তার ছায়া পড়ে আমাদের চোখের ভেতরে একটি বিশেষ পর্দায়—যার নাম 'রেটিনা' বা 'অক্ষি-পট'। রেটিনায় কোন জিনিসের ছায়া পড়লে রেটিনা সেই ছায়াকে গড়ে $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ড ধরে রাখে। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাক, তোমাদের চোখের



সামনে একটা লাল রঙের বল ধরা হলো। বলের ছায়া রেটিনায় পড়বে। তোমরা বলটা দেখতেও পেলে সঙ্গে সঙ্গে। এখন যদি বলটা হঠাৎই তোমাদের চোখের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে ঘটবে এক মজার ঘটনা। আসল বলটা অদৃশ্য হয়ে গেলেও রেটিনার ছায়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হবে না। রেটিনা বলের ছায়াকে আরও ১/৫০ সেকেণ্ড, বা এক সেকেণ্ডের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ সময় ধরে রাখবে। ফলে বলটা সরিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও তোমরা সেটাকে ১/৫০ সেকেণ্ড বেশি দেখতে পাবে। এই ঘটনাকে বলা হয় 'পারসিস্ট্যান্স অফ ভিসন' কিংবা 'দৃষ্টির স্থায়িত্ব'। আমাদের নেহাৎ সৌভাগ্য বলতে হবে যে রেটিনা এমন অদ্ভুত আচরণ করে। নইলে চলমান ছবি দেখা আমাদের পক্ষে আর কোনদিনই সম্ভব হতো না! সিনেমা অথবা টিভি-র মজার কোন স্বাদই পেতাম না আমরা! কেন, সেটা একটু আলোচনা করলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

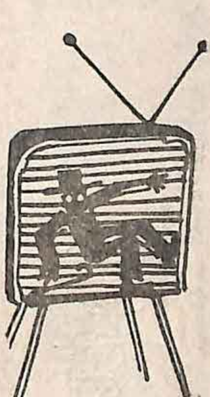
আমাদের রেটিনায় কোন আলোর ঝিলিক পড়লে তা ১/৫০ সেকেণ্ড অবিকৃতভাবে স্থায়ী হয়। কিন্তু তারপর সেই আলোর ঝিলিকের ছায়া ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসে। পুরোপুরি মিলিয়ে যেতে তার সময় লাগে ১/১৫ সেকেণ্ড। সুতরাং, যদি কোন ছবি তোমাদের এক সেকেণ্ডে পনেরো বার দেখানো হয় তাহলে তোমাদের মনে হবে ছবিটা বরাবর তোমাদের চোখের সামনেই রয়েছে; চোদ্দবার যে সেটা ক্ষণেকের জন্য তোমাদের নজরের আড়াল হয়েছে সেটা তোমরা টেরই পাবে না। তবে প্রত্যেকবার ছবিটা চোখের সামনে হাজির হয়ে উধাও হওয়ার ১/৫০ সেকেণ্ড পর রেটিনায় তার যে ছায়া পড়ে, তার আলোর জোর বা উজ্জ্বলতা ক্রমশ কমতে থাকে। ফলে যখন ১/৫০ সেকেণ্ড পার হয় তখন রেটিনার ছবিটা সামান্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তারপর



আসল ছবিটা আবার পলকের জন্য চোখের সামনে হাজির হয় পূর্ণ উজ্জ্বলতা নিয়ে। সুতরাং রেটিনার ছায়া আবার $\frac{১}{৫০}$ সেকেণ্ডের জন্য বেশি উজ্জ্বল হয়ে পড়ে। তারপর আবার সেই ছায়া ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। তবে $\frac{১}{১৫}$ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেলে কিন্তু রেটিনার ছায়া একেবারে উধাও হয়ে যাবে!

উজ্জ্বলতা কম-বেশি হওয়ার এই খেলা চলতে থাকে বারবার। কিন্তু ঘটনা এতো দ্রুত ঘটে চলে যে তোমাদের শুধু মনে হবে ছবিটা সামান্য কাঁপছে। এই অসুবিধেটুকু দূর করার জন্য যদি সেকেণ্ডে পঁচিশটা করে ছবি দেখানো হয় তাহলে দেখবে কোন গোলমাল আর নেই। ছবিটা তোমাদের চোখের সামনে স্থির হয়ে রয়েছে বলেই মনে হবে।

টিভি-তে সাধারণতঃ যেসব ছবি আমরা দেখি সেগুলো নড়েচড়ে বেড়ায়—অর্থাৎ, চলচ্চিত্র। ধরা যাক, ছবিতে দেখানো হচ্ছে একটি লোক হেঁটে যাচ্ছে। এই ঘটনাটিকে যদি আমরা দশটা স্টিল ফটো বা স্থিরচিত্রে ভাগ করে সেই দশটা ছবিকে এক সেকেণ্ডের মধ্যে পরপর দেখিয়ে যাই, তাহলে সেটা পরিণত হবে চলচ্চিত্রে। দেখা যাবে, লোকটি হেঁটে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তার এগিয়ে চলার মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস তোমাদের নজরে পড়বে। মনে হবে, লোকটি কেমন যেন হ্যাঁচকা মেরে হেঁটে চলেছে—অনেকটা কোন কার্টুন ছবির মতো। এর কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো? সেকেণ্ডে কমপক্ষে পঁচিশটা ছবি না দেখালে আমাদের চলচ্চিত্র দেখতে অসুবিধে হয়। এখানে যেহেতু এক সেকেণ্ডে মাত্র দশটা ছবি দেখানো হচ্ছে, সেহেতু লোকটির চলাফেরা তোমাদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকবেই। এই চলচ্চিত্রকে স্বাভাবিক করতে গেলে, লোকটির হেঁটে চলার দৃশ্যকে কমপক্ষে মোট পঁচিশটি



স্থিরচিত্রে ভাগ করতে হবে, এবং সেগুলো পরপর দেখাতেও হবে মাত্র এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে; তাহলেই সেটা হবে একটা খুঁতহীন চলমান ছবি। এ ধরণের চলমান ছবির প্রত্যেকটি ছবিকে আমাদের চোখ অথবা রেটিনা আলাদা করে আর চিনতে পারে না; বুঝতে পারে না একটি ছবি থেকে অন্য ছবিতে যাওয়ার ব্যাপারটা। কারণ তার সেই বিচিত্র ধর্ম ঃ দৃষ্টির স্থায়িত্ব। এই জন্যেই টিভি-তে এক সেকেণ্ডে পঁচিশটা করে ছবি দেখানো হয়। সংখ্যাটি পঁচিশের বেশি হলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু কম হলেই দর্শকের বিপদ দেখা দেবে।

এইবারে আসা যাক লাইনের সংখ্যার প্রসঙ্গে। এক ডিগ্রি কোণকে সমান ষাট ভাগে ভাগ করলে সেই একটা ভাগকে বলা হয় এক মিনিট কোণ, বা সংকেতের সাহায্য নিলে, ১´।

মনে করো, কারো চোখ থেকে কিছুটা দূরত্বে দুটো সরলরেখা আঁকা রয়েছে। দুটো সরলরেখাকে যদি কাল্পনিক কোন রেখা দিয়ে দর্শকের চোখের মণির সঙ্গে যোগ করা হয়, তাহলে সেই কাল্পনিক রেখা দুটোর মধ্যে একটা ছোট কোণ তৈরি হবে।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই কোণ যদি এক মিনিটের বেশি হয়, শুধুমাত্র তখনই সরলরেখা দুটোকে দর্শকের চোখ আলাদা করে দেখতে পাবে। এক মিনিট বা তার কম হলে দুটো লাইনকে একটা লাইন বলে মনে হবে। এইরকম দুটো লাইন বা দুটো বিন্দুকে স্পষ্টভাবে আলাদা করে দেখতে পাওয়ার যে ক্ষমতা তাকে বলা হয় চোখের 'বিশ্লেষণ ক্ষমতা' বা 'রিসোলিউশন'। সব স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষেরই এই ক্ষমতা মোটামুটি-ভাবে এক।



সুতরাং টিভির ছবির ঐ ৬২৫টা লাইনের পরস্পরের

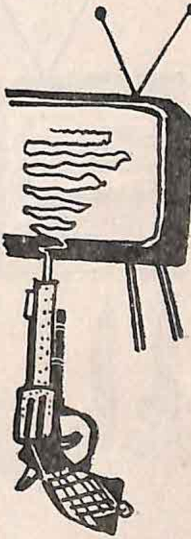
মধ্যে দূরত্ব এমনভাবে বাছা হয়েছে যাতে টিভি থেকে এক মিটার দূরে বসলে গোটা ছবিটা আমাদের চোখে মাত্র দশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে—অর্থাৎ, মোট ৬০০ মিনিট কোণ। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, মোটামুটি এক মিটার বা তার চেয়ে বেশি দূরে বসে টিভি দেখলে, ইলেকট্রনের তৈরি ঐ সরু সরু লাইনগুলো যেন আলাদা আলাদাভাবে আমাদের চোখে ধরা না পড়ে।

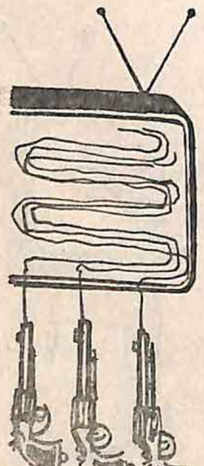
তাহলে দেখা যাচ্ছে, যদি মোট ছ'শো লাইন টিভির পর্দায় থাকে, তাহলেই যে কোন দুটো লাইন এক মিটার দূরে এক মিনিট কোণ উৎপন্ন করবে, যেহেতু গোটা ছবিটা উৎপন্ন করে ৬০০ মিনিট কোণ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আরো বেশি সাবধানী। তাই তাঁরা ৬০০-এর চেয়েও পঁচিশটা বেশি লাইন, অর্থাৎ, ৬২৫টা লাইনের ব্যবস্থা করেছেন। ফলে টিভি দেখতে বসে কোন অসুবিধেই আর আমাদের হয় না।

সাদা-কালো টেলিভিশনের পালা শেষ করে এবারে রঙিনটিভি-র কথায় আসা যাক। রঙিনটিভি-র ভেতরের কায়দা-কানুন মোটামুটিভাবে সাদা-কালোর মতোই, তবে কিছু কিছু তফাৎ রয়েছে।

রঙিন টিভি-র ছবিতে মোট রঙ থাকে তিনটে ঃ লাল, সবুজ ও নীল। এই রঙ তিনটে থাকার কারণ, লাল, সবুজ ও নীল রঙকে সমান পরিমাণে মেশালে তৈরি হয় সাদা রঙ। রঙিন টিভি-র ছবি রঙ-বেরঙের হলেও জানবে তার মূল রঙ তিনটে লাল, সবুজ ও নীল। এই রঙগুলো বিভিন্ন মাপে মিশে তৈরি হয় বিভিন্ন রঙ।

রঙিন টিভি-র টাওয়ার থেকে যে চিত্র-সংকেত প্রেরণ করা হয় সেটা অ্যানটেনা দিয়ে ঢুকে পড়ে টিভি-র ভেতরে। সেখানে এক বিশেষ ব্যবস্থায় লাল, সবুজ ও নীল, এই তিনটে রঙের চিত্র-সংকেতকে আলাদা করে ফেলা হয়।





রঙীন টিভি-তে থাকে তিন-তিনটে ইলেকট্রন-বন্দুক। বুঝতেই পারছো, তিনটে রঙের জন্যই এই ব্যবস্থা। লাল রঙের চিত্র-সংকেত চলে যায় লাল রঙের জন্য নির্দিষ্ট ইলেকট্রন-বন্দুকে। সবুজ রঙের সংকেত চলে যায় সবুজ বন্দুকে। আর নীল রঙ একই ভাবে নিজের পথ খুঁজে নেয়। ফলে, তিনটে ইলেকট্রন-বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনের স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করে তিনটে বিভিন্ন চিত্র-সংকেত। তারপর একই-ভাবে টিভি-র পর্দায় শুরু হয়ে যায় তিনটে ইলেকট্রন-বর্শার আঁকিবুকি বা 'স্ক্যানিং'। রঙীন টিভি-র পর্দায় লাগানো থাকে এক বিশেষ ধরনের প্রতিপ্রভ আস্তরণ। তার নাম 'ফস্‌ফর ডট্ প্লেট'। এতে তিন ধরনের ফস্‌ফর-বিন্দু বেশ কায়দা করে সাজানো থাকে : ইলেকট্রন এসে আছড়ে পড়লে একটি বিন্দু দেয় লাল আলো, দ্বিতীয়টি দেয় সবুজ ও তিন নম্বর বিন্দুটি দেয় নীল আলো। নির্দিষ্ট ইলেকট্রন-বন্দুকের ইলেকট্রন সবসময় নির্দিষ্ট ফস্‌ফর-বিন্দু বরাবর পথে চলে। যেমন, লাল ইলেকট্রন-বন্দুকের জন্য লাল বিন্দু, সবুজের জন্য সবুজ, আর নীলের জন্য নীল। এই বিশেষ প্রতিপ্রভ পর্দায় লাল, সবুজ বা নীল, যে যে বন্দুক থেকে ইলেকট্রন এসে আছড়ে পড়ে, পর্দায় ঠিক সেই সেই আলো দেখা যায়। ইলেকট্রন স্রোতের বিভিন্ন মিশেলে রঙের বিভিন্ন মিশেল ফুটে ওঠে টিভি-র পর্দায়। তখন প্রয়োজনীয় ছবিটা আমরা দেখতে পাই। কোন কারণে যদি একটা ইলেকট্রন-বন্দুক অকেজো হয়ে যায়, অথবা কোন একটা চিত্র-সংকেত-এ গোলমাল দেখা দেয়, তাহলে রঙীন টিভি-র ছবির রঙেও গোলমাল দেখা দেবে।

রঙীন টিভির বেলায়ও ৬২৫ ও ২৫ সংখ্যা দুটোকে সসম্মানে বহাল রাখা হয়। কারণ? কারণটা তো তোমরা ভালো করেই জেনে গেছো, তাই না?

———

এ-বই সম্পর্কে

বিজ্ঞানের হরেকরকম * অনীশ দেব ৭·০০

রহস্যময় বিজ্ঞানের হরেকরকম রহস্য যেন জলের মত সহজ করে পাতার পর পাতা খুলে মেলে ধরা হয়েছে সবার সামনে। যে খোলাপাতা থেকে জানা যায়—

মাছি সেকেণ্ডে কতোবার ডানা নাড়ে, ব্রিজের ওপর সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করে যাওয়া নিষেধ কেন, প্রাচীনকালে মানুষ জানতো পৃথিবী থালার মতো চ্যাপ্টা, সেই পৃথিবী কি করে পাল্টে গেলো আজকের গোল চেহারায়, ঝাড়-লণ্ঠন থেকে কি করে আবিষ্কার হলো পেণ্ডুলাম, কিংবা বুদ্ধি কেমন করে মাপে।

এইরকম দারুণ সব বিষয় নিয়েই তৈরি হয়েছে বিজ্ঞানের হরেকরকম। এছাড়া রয়েছে প্রতি পৃষ্ঠায় মজার মজার সব ছবি।

লেখক সম্পর্কে



জন্ম ২২শে অক্টোবর, ১৯৫১, কলকাতায়। প্রথম পড়াশোনা হিন্দু স্কুলে। তারপর সাম্মানিক পদার্থ-বিদ্যায় বি. এস. সি, এবং কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ থেকে ফলিত পদার্থ-বিদ্যায় বি. টেক পাশ করেন। ১৯৭৬ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. টেক ডিগ্রী লাভ করেন। একটি আন্তর্জাতিক কারিগরী সংস্থায় ডিজাইন ইঞ্জিনীয়ার (ইন্‌স্ট্রুমেণ্টেশন) হিসেবে তিন বছর যুক্ত থাকার পর বর্তমানে বিজ্ঞান কলেজে গবেষণায় নিরত।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় লেখকের চর্চা এক যুগ ব্যাপী হলেও এটি তার বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম বই।

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : **অনীশ দেব**